চন্দ্রমল্লিকা

ভবানী মুখোপাধ্যায়

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ১২

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রিয়বরেষু

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য বই

স্বর্গ হইতে বিদায়

কালো রাত

অগ্নিরথের সারথি

একালিনী নায়িকা

কান্না-হাসির দোলা

বনহরিণী

সেই মেয়েটি

নির্জন গৃহকোণে

সূচী

চন্দ্রমল্লিকা	১
কাটা সৈনিক	১৮
তুচ্ছ	৩৭
ক্ষণ বসন্ত	৪৬
নূতন ঠিকানা	৫৮
জলপানি	৭৪
নূতন নায়িকা	৮০
পাখির বাসা	৯২
কাঠ গোলাপ	৯৯
প্রতিষ্ঠা	১১৭
কেন্দ্রবিন্দু	১২৫
বিনি সুতোর মালা	১৩০

চন্দ্রমল্লিকা

চন্দ্রমল্লিকা

আমাদের ফণী সেন আর নেই। সম্প্রতি তার মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর জন্য একরকম আমি-ই দায়ী। শেষটায় পরোক্ষ ভাবে আমিই তার মৃত্যু ডেকে এনেছি।

ফণী সেনের কথা মনে পড়ে। রোগ-জীর্ণ শরীরটা মোটা গলাবন্ধ কোটে ঢেকে পাঁচটার পর অফিস থেকে বেরোতেন, সেই মূর্তিটাই আজ নজরে ভেসে আসে। সার্টের মলিন কলার কোটের ভিতর থেকে উঁকি দিত। কি শীত, কি গ্রীষ্ম—ছাতা এবং চাদর এক ভাবেই থাকতো। বাঁ হাতটা থাকতো কোটের লম্বা পকেটে ঢোকানো।

স্যানেটোরিয়ম থেকে ফিরে আসার পর অবশ্য ফণী সেনের এই আকৃতি হয়েছিল। অসুখের আগে ঝাড়ুদার আর দারোয়ান ভিন্ন কেউ তাকে কখনও আফিসে আসতে দেখেনি। ফিরতেও নয়। আমরা বলাবলি করতাম, সরকারের নিমক খেয়েছে ফণী, সুদে-আসলে পুষিয়ে দিচ্ছে। পাঁচটার পর নিরালায় বসে কাজ করতেই তার বেশী ভাল লাগে। আমরা সবাই বিদায় নিয়ে চলে আসতাম আর পুলকিত চিত্তে ফণী সেন ফাইল টেনে নিয়ে বিজয়ীর দৃপ্ত ভঙ্গীতে বসত। যে-আনন্দে ওস্তাদ শিল্পী তার বাদ্যযন্ত্রকে বুকে টেনে নেয়, ফণীর মুখে সেই আনন্দ।

এই আতিশয্য কিন্তু বেশী দিন সইল না, ধীরে ধীরে কোন্ ফাঁকে দেহে ক্ষয়রোগ প্রবেশ করল, কেউ জানতে পারেনি। তার পর তোড়জোড় করে কর্সিয়ঙের স্যানেটোরিয়মে পাঠানো হয়েছিল; এক বছর কি তার কিছু বেশী দিন সেখানে থেকে রোগ সারিয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু উৎসাহের অগ্নিশিখা এত দিনে নিঃশেষিত। শুধু

দেহের কংকালটুকু আছে, তার ওপর চামড়া ঢাকা। আমি ওর মুখের পানে তাকাতে পারতাম না, মাথাটা যে কোন শক্তিমান লোকের মুঠির চাইতে বড়ো নয়, চোখ দুটো কোথায় ঢুকে আছে, গাল দু'টি ভেঙে গেছে, কিন্তু চোখে এসেছে একটা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য। ওর মুখের দিকে তাকালে আমাদের দেহের সজীবত্ব যেন লজ্জিত হয়। আমারও ভালো লাগত না। ভয়-ভয় করতো, একটু কাশলে চমকে উঠতাম, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারতাম না। নতুন যৌবন নিয়ে ফণী ফিরেছে এমনই তার মনোভংগী।

তবু এমনই অদৃষ্টের পরিহাস, তার সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা রাখতে হয় বেশী। তাকে সদুপদেশ দিই। আর সব সহকর্মীরা ফণীকে এতটুকু সহানুভূতির চোখে দেখতো না, তাই আমাকেই সেই ক্রটীটুকু মানিয়ে নিতে হ'ত। ওরা তাকে এড়িয়ে চলত, তাদের সেই বিরক্তি ও উপেক্ষা গোপন রাখবার চেষ্টা করতাম আমি। অতীতে যাঁরা তার অন্তরঙ্গ ছিলেন, এখন যে কোন একটা সূত্রে রসিকতা করাটাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। কেমন একটা বিদ্বেষের ভাব, যেন ফিরে এসে ফণী মহা অন্যায় করেছে। মনে মনে তাকে সবাই খরচের খাতায় রেখেছিল, এখন তার নবজন্মে সকলেই আশাভঙ্গের জ্বালা ভোগ করছে। আমি যদিও এজন্য তাদের তিরস্কার করতাম, কিন্তু ভেবে দেখেছি, আমার সেই তিরস্কারের পিছনে সদিচ্ছার চাইতে ওদের মত স্পষ্ট করে কথা না বলার অক্ষমতাটাই সর্বপ্রধান হয়ে উঠেছিল।

এই ভাবে একটা সখ্যতা গড়ে উঠেছিল, অস্বাভাবিক অথচ অন্তরঙ্গ। অসুস্থ মানুষটির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল। তার কাজের কিছু অংশ কেড়ে নিয়ে আমিই করে দিতাম। ঠিক পাঁচটার সময় যাতে বাড়ি যায়, তার জন্য তাকে জোর করে উঠিয়ে দিতাম, আর কৌশল সহকারে তার মনে একটা বিশ্বাস সৃষ্টি

করেছিলাম, তার ফলে আর পাঁচ জনের চাইতে তফাৎ করে সে আমাকে দেখতো। আমার সহৃদয়তায় ওদের শত্রুতার জ্বালা জুড়িয়ে যেত।

ফণী সেন আমার চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বড়ো। অনেক চেষ্টার পর এই ভাবে আমাদের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল।

কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন টি'কলো না। এই ভয় করেছিলাম। পূজোর কিছু আগেই স্যানেটোরিয়ম থেকে ফিরে এসেছিলো ফণী সেন। কে যে তাকে উপদেশ দিয়েছিল কে জানে? আর একটু শীত পড়তেই পৌষ মাসের মাঝামাঝি সে আবার বিছানায় পড়লো।

আর যাই হোক আমি যেন একটু স্বস্তি পেলাম, অন্তরে দীর্ঘকাল পরে পেলাম মুক্তির স্বাদ। গত পাঁচ-সাত বছর যে-ভাবে কাটিয়েছি এখনকার টেম্পো তার চেয়ে দ্রুততর। আমার এক রাশ ফুল এনে ঘর সাজালাম, মাঝে-সাঝে থিয়েটার, বায়োস্কোপ, ইত্যাদি হালকা আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাতে লাগলাম। ফণী সেন যেন আমাকে মুক্তি দিয়েছে।

জীবনের আনন্দকুণ্ডে যেন আমি নগ্ন হয়ে অবগাহন করছি। ফণী সেন যেন এতকাল আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

আমার বন্ধুরা কেউ যে বৈদ্যবাটী পর্যন্ত গিয়ে ফণী সেনের কুশল সংবাদ নিয়ে আসবে, এ আশা আমি করিনি। আর জানতাম, যতই মনকে আঁখি ঠেরে এড়িয়ে চলি না কেন, আজ হোক আর কাল হোক আমাকে বৈদ্যবাটী ছুটতে হবে। কিন্তু যাওয়ার কথা মনে হ'লেই আমার মনে আতংক হত। আমার বড়বাবু গোপনে এক দিন বলেছিলেন—"ফণী আর এ যাত্রা কাটিয়ে উঠতে পারবে না, ডাক্তাররা যা রিপোর্ট নিয়ে এসেছে তাতে বোধ করি শীতটাও

কাটবে না। স্যানেটোরিয়মে যাওয়ার আগে যা ছিল, এখন অবস্থা তার চেয়েও খারাপ।"

মনে মনে কল্পনা করতাম ফণী সেনের রোগশয্যা, আর শিউরে উঠতাম, কে তার সেবা করবে? সেই ক্লান্ত দুঃখিনী স্ত্রী পাশে বসে চোখের জল ফেলছে। ফণী সেনের ভাগ্য ভালো, ছেলেপুলের হাঙ্গামা নেই। কিন্তু হয়ত একগাদা আত্মীয়-স্বজন আছে, মৃতদেহ দেখলে আকাশে যেমন শকুনি ওড়ে, তেমনই আত্মীয়-কুটুমেরা আসন্ন মৃত্যুর গন্ধ পেলে এসে ভিড় জমায়। বিশেষতঃ ফণী সেনের অনেক টাকা, পৈতৃক আর শ্বশুরদত্ত। তাই আমার বৈদ্যবাটী যাত্রা মহাপ্রস্থানের পথে পাড়ি দেওয়ার মতই কঠিন ও কঠোর, যেন খাইবার গিরি-সংকটের শেষ-প্রান্তে যেতে হবে।

পৌষ শেষ হয়-হয়, তখনো আমার দীর্ঘসূত্রতা কাটে না। যা হ'বার তা হবেই, কি হবে আমার গিয়ে, কতটুকু উপকার করতে পারবো, তারও কিছু করতে পারবো না, আর আমার কষ্ট বাড়বে। আরো এক মাস কাটলো, যে ভাবে দিন কাটাচ্ছিলাম, সেই ভাবেই দিন কাটতে লাগল। কত পুরাতন বন্ধু, কত পুরাতন আড্ডায় আবার নতুন করে গেলাম, কত বই পড়লাম,—দেখলাম, শুনলাম—মনে হল বয়স যেন অর্ধেক কমে গেছে। যেন সবাইকে চাই, সকলকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চাই, দুনিয়াটা করতল-আমলকের মত ছোট হয়ে এসে ধরা দিয়েছে আমার মনে।

তারপর বড়দিন, সেদিন সহসা জুতা-জামা পরে বৈদ্যবাটির দিকেই পাড়ি দিলাম। ছুটির দিনে মনে এক বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়, হিমালয়ের শিখরে বসে থাকলেও ছুটির দিনের আমেজ নিশ্চয়ই গায়ে লাগবে। আমার ফ্লাটবাড়ির বারান্দায় বসে আমার তাই সহসা মনে হল এইবার সময় হয়েছে, এই বর্ষাঝরা শীতের অপরাহ্নে বৈদ্যবাটী যেতে আর বাধা কি! মন টানছে।

চারটের সময় বৈদ্যবাটী পেঁছিলাম। ষ্টেশন থেকে অনেকটা পথ, সাইকেল-রিক্সা সে ক্লেশহরণ করলো। দরজায় কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এলেন বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের এক মহিলা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গী, টল্‌টলে দু'টি ডাগর চোখ, আর সুন্দর নাক।

শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীর মত কপালে অবশ্য টিপ নেই, কিন্তু চোখে পাতলা কাজল আছে। সেই এক মুহূর্ত, কেমন বেসামাল হয়ে গিছলাম। একটু সচকিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—"ফণী সেন, মানে আমাদের ফণীদা বাড়ী আছেন?"

"আসুন। উনি ওপরে আছেন। ভেতরে আসুন।" কণ্ঠস্বর মধুর ও মোলায়েম।

"আপনি কি ফণীদার স্ত্রী? আমার নাম লুটবিহারী, অফিস থেকে আসছি। কেমন আছেন দেখতে এলাম।"

"আসুন, বেশ করেছেন। আপনার কথা উনি কত বলেন। ছাতাটা ত' দেখছি ভিজেছে, আপনিও ভিজেছেন খুব। একটা তোয়ালে এনে দিই। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সামনের ঘরে উনি আছেন। নীচে নেমে আসতে চাইছেন, সাহস করি না।" এই পর্যন্ত বলেই ফণীর স্ত্রী নীচে থেকেই চেঁচিয়ে বলে—"লুটবিহারীবাবু এসেছেন।"

অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর-সংসার। কোথাও এতটুকু অপ্রয়োজনীয় বস্তু নেই, বৈদ্যবাটী না বালিগঞ্জ সহসা ধরা যায় না, ক্ষণিকের জন্য মনে হবে বালিগঞ্জের হঠাৎ-গজানো ফ্যাসনেবল ধনীর বাড়ি এসেছি। সিঁড়ির গায়ে যামিনী রায়ের আঁকা ছবি পর্যন্ত রয়েছে। ভাবি, ফণী সেন কি যুদ্ধের আগে বিয়ে করেছিল, না পরে। বিয়েটা চুপি চুপি সেরেছিল। পরে জানাজানি হওয়ার পর অফিসেই টাকা দিয়ে ফিষ্টের ব্যবস্থা করেছিল, বাড়িতে ডাকেনি কাউকে। কিন্তু এই মহিলা তার পুত্রবধূ হওয়ার উপযুক্ত। তবে গবেষণা

করার বেশী সময় ছিল না, এক মিনিটের মধ্যেই ফণী সেনের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

চেঁচিয়ে বলি—"এই যে ফণীদা (সবাই ঐ নামেই ডাকতাম তাকে) কেমন আছো আজ-কাল ?"

বাইরে থেকে অবশ্য অফিসের সেই সংক্ষিপ্ত কালটুকুর চাইতে আকৃতি তেমন কিছু খারাপ দেখাচ্ছিল না। আমাকে বেশ বাছা-বাছা কথায় আশীর্বাদ জানালেন, ফণী সেন চিরকালই একটু সংযত এবং ভদ্র-টাইপের ব্যক্তি, আজকের আচরণেও তার বৈলক্ষণ্য নেই। তার পর বললেন—"এত-শত সত্ত্বেও খুব খারাপ নেই নুটবিহারী, সেইটাই আশ্চর্য্য। সবই তাঁর দয়া।" এই বলে পাখীর মতো উজ্জ্বল চোখ দু'টি আমার মুখের ওপর ধরলেন। অন্ধকারে যেন কে টর্চ ফেললো চোখের ওপর।

ফণী সেনের স্ত্রী কথায় বাধা দিয়ে বলে ওঠে—"আপনারা কথা বলুন, আমি বরং একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।"

আমি বুভুক্ষুর মতো এক দৃষ্টিতে ফণী সেনের স্ত্রীর চলে যাওয়ার ভঙ্গীটা লক্ষ্য করলাম।

ফণী সেন আবার বলে—"এত সব কাণ্ড নুটবিহারী—আছি কিন্তু ভালো। জানো ত' ডাক্তাররা বলেন ক্ষয়রোগীরা বুঝতে পারে না যে, শমন শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। মৃত্যুর মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছি নুটবিহারী, বুঝেছি সব মিথ্যা, ডাক্তারদের কথা। বই-টই সব মিথ্যা। আমার স্ত্রী অবশ্য বুঝতে পারেন না, আমি যে সব অবস্থাটা বুঝে নিয়েছি এটাও বুঝতে দিই না তাঁকে। ওকে আর সব কথা বলি না, কি হবে ওর জ্বালা বাড়িয়ে—"

—"কিন্তু ফণীদা তোমার হয়ত ভুল হচ্ছে, তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে, এতটা আশা করিনি, বেশ ইমপ্রুভ করেছো দেখছি। তার পর এই কটা দিন কাটলেই ফাগুন মাস, বসন্তকাল, শরীর আপনি সেরে উঠবে।"

—"অত দিন আর আমি থাক্‌ব না। তবে ভাই তার জন্য আমার এতটুকু দুঃখ নেই, আমি আনন্দে আছি। এমন কি আগে বছরের পর বছর যে ভাবে কাটিয়েছি, তার চেয়ে অনেক ভালো। জীবন এখন অতি দ্রুত তালে আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। তার কারণ বোধ হয় আলো নিভতে আর বাকী নেই। সামান্য ছোটখাটো ঘটনায় মন আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে, আমার প্রতিবেশী ভবভূতিবাবু প্রতিদিন এই পথে ষ্টেশনে যান। যাওয়ার সময় খবরের কাগজখানি নেড়ে আমাকে অভিনন্দন জানান। ঠিক যে সময় তিনি যান তা আমি জানি, তাঁর বাড়ির সদর দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পাই, আমি উঠে জানলার ধারে দাঁড়াই, উনি হাত তোলেন, অফিসে যাচ্ছেন, আমি আর কোন দিনই ও পথে যাব না—তার পর পথের বাঁকে মিলিয়ে যান, আমি এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ি। তোমার হয়ত' এসব কথা নিছক পাগলামি মনে হবে নুটবিহারী—"

"না, না. সে কি কথা"—আমি বাধা দিয়ে বলি। এই সঙ্গে আমার নিজের কথা মনে পড়ে। আমি ফণীদা'কে উৎসাহিত করার চেষ্টা করি। পূব দিকের ড্রেসিং-টেবলটায় চমৎকার একটি ফুল-দানিতে অনেক চন্দ্রমল্লিকা সাজানো রয়েছে লক্ষ্য করেছিলাম। ফণীদা'র স্ত্রীর রুচির প্রশংসা করেছিলাম মনে মনে। এইবার উচ্ছাস-ভরে বললাম—"চমৎকার ফুল নয়? ওর দিকে তাকালে মনে আনন্দ হয় না? সকালে উঠে যদি দেখো সারা আকাশ মেঘে ঢাকা—ও বাড়িটাও দেখা যাচ্ছে না, তাহলে কেমন লাগে? সব কিছুতেই আনন্দ জাগে মনে। কেমন তাই না?"

"হ্যাঁ তা বটে, তবে—"

"দাঁড়াও, স্যানেটোরিয়ম থেকে যে চলে এসেছো তার জন্য তুমি খুসী না ফণীদা? আর বোধ হয় মনে মনে ভাবছিলে যে, আমি এক দিন আসবো। তাই না?"

বালিশ থেকে মাথা তুলে ফণীদা উঠে বসে, কি যেন বলার চেষ্টা করে।

আমি বাধা দিয়ে বলি—"চুপ! তোমার স্ত্রী হয়ত' আমার ওপর চটে যাবেন।"

ছোট্ট শিশুর মতো শান্ত হয়ে আবার শুয়ে পড়ল ফণীদা।

"তবে ন্টুবিহারী তোমার কথাই ঠিক, যোলো আনা ঠিক, আমার মন বলছিলো তুমি নিশ্চয়ই এক দিন আসবে, এলে বলে।"

আমি হেসে বললাম—"দুনিয়াটা অদ্ভুত ফণীদা।"

ফণীদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—"কেন যে আমরা সহজে কাউকে চিনি না বুঝি না! এত দিন ধরে কেবল অন্ধকারে ঘুরে মরেছি। আমার এই অসুখ যদি না করতো কিছুই বুঝতাম না। এখন যদি আবার সেরে উঠি, এখনো যা করি তাই করে যাব।"

কথাটা আমার কানে অদ্ভুত শোনালো। আমি বিষাদভরা কণ্ঠে বললাম—"অমন কথা ক'জন বলতে পারে?"

মধুর ভঙ্গীতে হেসে ফণীদা বলে—"দেখো অনেক কিছুই রোগ-শয্যায় শুয়ে লক্ষ্য করা যায়, তখন আমাদের হাতে আর অন্য কাজ থাকে না। ও-দিকের ওই ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে দেখো—ঐ যে তোমার পেছনেই—"

আমি পেছনে তাকালাম আলমারির সামনে ছোট্ট একটি টিপয়ের ওপর পেতলের ছোট কলসীর মতো ফুলদানীতে কয়েক গুচ্ছ রঙ্গন ফুল সাজানো রয়েছে দেখলাম।

কিঞ্চিৎ হতভম্ব হয়ে ফুলগুলি দেখে বললাম—"বাঃ, চমৎকার রঙ্গন ফুল ত'! তোমার বাগানের?"

"না, বাগানের নয়, আমার ভাগনে বরানগর থেকে এনেছে। আচ্ছা বলোত' কোন ফুলটা আমার পছন্দ—চন্দ্রমল্লিকা না রঙ্গন?"

অনেক ভেবে-চিন্তে বললাম—"চন্দ্রমল্লিকা।"

হেসে ফণীদা বলে—"ভুল হল ভাই, এইখানে চুপচাপ শুয়ে কত কথা ভাবি। আমার মনে হয় ঐ চন্দ্রমল্লিকা হল শুভ্র-শুচি পবিত্রতার প্রতীক আর ঐ রঙ্গন হল জীবনের প্রতীক। আগুনের মত লাল, অথচ আবেগ আর আকুলতায় ভরা। তুমি তো জানো সীতার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে আজ এগার বছর, আমরা পরস্পর ভালবেসেই বিয়ে করেছি, আজ এগারো বছরে আমাদের মধ্যে এতটুকু মতবিরোধ ঘটেনি। ভারি ঠাণ্ডা মেয়ে। ভারি ধর্মশীলা। উপবাস আর পূজা-অর্চনায় সারা দিন কাটিয়ে দেয়। তাই ভাবি ও যদি চন্দ্রমল্লিকা না হয়ে রঙ্গন হ'ত ?"

ঠিক সেই সময় সেই তপশ্চারিণী মহিলাটি ঘরে এসে ঢুক্‌লেন। আমার অতি অদ্ভুত লাগছিল, এই আগুনের শিখা যে শান্ত সমাহিত নদীর মতো নিস্তরঙ্গ, একথা ভাবতেও যেন মন চায় না।

অতি কোমল গলায় মহিলাটি বললেন—"আপনাকে একটু পাশের ঘরে আস্‌তে হবে। মুটবিহারীবাবুর জন্য একটু চা করেছি।"

ফণী সেনের বিছানার পাশের ছোট্ট টিপয়ে কি সব ঠিকঠাক্ করলেন, তাঁর মুখে তখন টেবল-ল্যাম্পের ম্লান আলো এসে পড়েছে, কালোচুলের জ্যোতি আমার নজরে পড়লো, বুকের পাশে আলো-ছায়ার খেলাও লক্ষ্য কর্‌লাম ! সেই মুহূর্তে ভাবলাম—ফণীদার মৃত্যু হলেও এ বাড়িতে আমার যাতায়াত হয়ত শেষ হবে না। আমার জীবন-তিয়াসা আজ কিছুকাল ধরে আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তারপর এই বর্ষাস্নাত বৈদ্যবাটী, প্রৌঢ় ফণী সেনের নতুন জীবনদর্শন, নতুন আনন্দের আস্বাদ, সব যেন শেষ অংকে এসে পৌঁছেচে।

সীতা দেবীর আমন্ত্রণে উঠে দাঁড়ালাম।

পাশের ঘরটি খাওয়ার ঘর, সেই ভাবে সাজানো। ঘরটিতে ঢুকে মনে হল, মনে এতটুকু ভণ্ডামি রাখা ভালো নয়, সীতা দেবী যেমন ধর্মশীলা, আমাকেও তেমনই পবিত্র থাকতে হবে।

সীতা দেবীই প্রথম কথা বললেন: "উনি আপনাকে দেখে ভারি খুসী হয়েছেন। কেউ ত' তেমন আসে না।"

আমি চায়ের কাপটা তুলে ধরলাম। বললাম—"আচ্ছা ফণীদা ত' মিশনে দীক্ষা নিয়েছিলেন, প্রায়ই বেলুড়ে যেতেন। সেখানকার কেউ—?"

একটু যেন কুণ্ঠিত হলেন সীতা দেবী। বললেন—"এক জন মহারাজ মাঝে মাঝে আসেন, খবরাদি নিয়ে যান। অনেক সাহায্য করেন।"

"নিশ্চয়ই ভালো লোক।" কথাটা অকারণে বলে ফেললাম।

সীতা দেবীর ভ্রূটা যেন ঈষৎ কুঞ্চিত হল, টানা ঘন ভ্রূ। নিখুঁত বলা যায় না, বেশ পুরু, চমৎকার টিকোলো নাকের ওপর এসে থেমেছে। সীতা দেবীর রূপটা কিঞ্চিৎ অদ্ভুত, উগ্র রঙ নেই, বরং বেশ মলিন বলা চলে, অথচ সব জড়িয়ে এমন একটা অপরূপ রূপ যে, ইচ্ছে করে প্রাণভরে কিছুক্ষণ দেখি। নিবিড় কালো চুল, টলটলে চোখ—তারা দু'টি যেন জ্বলছে।

"ভালো লোক! তা নিশ্চয়ই! কি অদ্ভুত যে কথাটা! কি যে ভালো আর কি মন্দ, কে জানে? না-না, সন্দেশটা খেয়ে ফেলুন, বাড়িতে ছানা কাটিয়ে তৈরী করেছি।"

"যদি ধরুন যাদের কাছ থেকে আমরা ভালোটাই আশা করি, তারা যদি সহসা অদ্ভুত আচরণ স্বুরু করে? তাহ'লে কিন্তু পৃথিবীর স্বাদ পালটে যাবে। মনে হবে যেন সমুদ্রে বিক্ষোভের ফলে মাটিতে ঝড় উঠেছে!"

ঘরে অসীম স্তব্ধতা, সীতা দেবী বললেন—"আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আর একটু চা দিই?"

আমি মুখের সন্দেশটা গিলে কাপের তলানিটুকু গলায় ঢেলে বললাম—"ধন্যবাদ! কিন্তু চা আর না, আপনি কিন্তু আমার কথা ঠিক বুঝেছেন।"

সীতা দেবীর মুখখানি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল—ক্ষীণ হেসে বললেন—"আপনি ত' ভয়ানক লোক!"

আমি হেসে উঠলাম।

সীতা দেবী চুপি চুপি পাশের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—"আমার স্বামী কিন্তু আজ-কাল সহজেই ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েন। অসুখের ফলে বোধ করি জেলাসিটা বাড়ে।"

"সেই জন্যই বেশী কেউ এ বাড়িতে আসে না, তাই নয়?"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। সেই মুহূর্তে ফণী সেনের বিবাহিত জীবনের প্রকৃত রূপ আমার চোখের উপর ভেসে উঠল। বললাম—"তাই বুঝি মিশনের কাজে আপনার তেমন উৎসাহ নেই? তাই মহারাজ লোকটি কেমন বলতে আপনি কুণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন? তাই দোরগোড়ায় আপনাকে দেখে যখন থমকে দাঁড়িয়ে ভাবছি এই কি ফণী সেনের স্ত্রী, তখন আপনি খুসী হয়েছিলেন। বলুন আপনার মনে চাঞ্চল্য আসেনি?"

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সীতা দেবী ধরাগলায় বললেন: "চলুন, ও ঘরে যাই, উনি অনেকক্ষণ একা আছেন।"

মাথা নেড়ে বললাম—"এখন ফণীদা অনেক দূরে—" বললাম বটে কিন্তু আমার বিশ্বাস তা নয়। জেলাসি তার মনে প্রবল। ঐ যে আমাকে বললে স্ত্রী বড়ো ধর্মশীলা, যদি একটু কম হ'ত—ওর ভিতরই তার মনের কথা লুকানো আছে।

তাহ'লে কি সীতা দেবী তাঁর স্বজাতিসুলভ স্বাভাবিক বৃত্তি-প্রভাবে ফণী সেনের চোখে ধূলো দিতে পেরেছেন? বাসনা আর ঈর্ষা মানুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে। ফণী সেনের প্রৌঢ়বয়সের প্রেমে পড়ে বিয়েকরা স্ত্রী সম্পর্কে তার কি মনোভাব কে জানে! তার এই ক্ষয়গ্রস্ত শরীরে কামনার বিকার প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু সে কামনার পরিতৃপ্তির সঙ্গে ওর জীবলীলা সাঙ্গ হবে। ধর্মের আবরণে নিজের যৌন-মনোবিকার চাপা দেওয়ার চেষ্টা

করেছে ফণী সেন, নিজে ধর্মধ্বজ সেজেছে, ভক্তিযোগ আর কর্ম-যোগের জ্ঞানগর্ভ বাণী আউড়েছে। মনে মনে কিন্তু আরো পাঁচ জনের মত ক্লেদাক্ত কামনার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরছে। এ আর এক ছদ্মবেশ। আমি সহসা সীতা দেবীর মুখের পানে চেয়ে আতংক ও ভয়মিশ্রিত এক আকুল দৃষ্টি লক্ষ্য করলাম।

মৃদুগলায় সীতা দেবী বললেন," ডাক্তারবাবু বলেছেন এর পর যে কোনো দিন রক্ত উঠলেই আর বাঁচানো যাবে না।"

আমি উন্মাদের মত বলে ফেললাম—"আর আপনি ?

আবার অন্য দিকে মুখ ফেরালেন সীতা দেবী।

আমি আবার বললাম, "আর আপনি" কথাটা শেষ করতে পারলাম না।

সহসা যেন উত্যক্ত পশুর মতো ক্ষিপ্ত হয়ে সীতা দেবী সরোষে বলে উঠলেন—"এ ভাবে আমাকে ব্যঙ্গ করার কোন অধিকার আপনার নেই। আমার স্বামীর অসুখ বেড়ে যেতে পারে। নইলে আপনাকে এ বাড়ী থেকে বার করে দিতাম। কে আপনি ? বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত হঠাৎ এসে আমাকে উপহাস করবেন, আমার জ্বালা বাড়িয়ে দেবেন ? আপনার কোনো অধিকার নেই এ ভাবে কথা বলার। আমি এতটুকু অন্যায় করিনি, অন্যায় সইবো না—"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে অসীম সাহসে সীতা দেবীর বাঁ হাতটা ধরলাম। তিনি হাতটা মুক্ত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন, আমি কিন্তু আরো জোরে ধরে রইলাম। শেষ পর্য্যন্ত হাল ছাড়লেন সীতা দেবী। আমি তাড়াতাড়ি আর এক পেয়ালা চা তৈরী করে বললাম—"নিন এই চাটুকু খেয়ে ফেলুন।"

"না,"—

"নিন, খেয়ে ফেলুন।"

"আমি চা খাই না"—

"আজ কিন্তু খেতে পারেন, শীত প্রবল, বৃষ্টি পড়ছে।" কাঁপতে কাঁপতে চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিলেন সীতা দেবী। তার পর ছোট মেয়ের মত এক চুমুকে সব চাটুকু খেয়ে ফেললেন।

আমি সিগারেট ধরিয়ে আবার বললাম। নাটকীয় ভঙ্গীতে বললাম, "এই ভাবে একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে দু'জনে বসে আছি, এ কি আশ্চর্য কাণ্ড নয়! এই ভাবে কথা বলছি,—জীবন যেন আমাদের শিরায় আজ গভীরতর হয়ে স্পন্দমান। এরকম আর কোনো দিন মনে হয় নি।"

প্রায় এক মিনিট কোনো উত্তর নেই।

অবশেষে সীতা দেবী কথা বললেনঃ "এ এক যন্ত্রণা, আমাদের বিয়ের আগে উনি কি রকম ছিলেন আপনার মনে আছে?

"কিছু কিছু আছে। ঠিক যে সময় বিয়ে হয়, আমি তখন কিছু দিনের জন্য দিল্লী অফিসে বদলী হয়েছিলাম। এসে সব খবর পেলাম।"

"বিয়ের আগে উনি অন্য রকম ছিলেন। আনন্দময় সামাজিক প্রাণী, সৎ, সাদাসিধে। তার পর বিয়ের পর এইখানে জমি কিনে বাড়ী তৈরী হল। আমার বয়স তখন বাইশ, যতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন চোখে-চোখে রাখেন।"

সহসা দোরের দিকে তাকিয়ে অতিশয় ভীত ভঙ্গীতে চায়ের কাপটা টেবলে নামিয়ে রাখলেন সীতা দেবী। বুঝলাম বেশ ভয় পেয়েছেন।

আমি সাহস দিয়ে বললাম—"কেউ নয়! ভয় কি?"

সেই রকম কম্পিত গলায় সীতা দেবী বললেন—"কেমন যে হয়ে গেলেন উনি, পয়সাকড়ির দিক থেকে অতিশয় কৃপণ, যারা কৃপণ হয় তাদের মন কত ছোট হয় জানেন ত'? সংসারের খরচ বাবদ সামান্য দিতেন, আর দিবারাত্র চোখে-চোখে রাখতেন, বোধ হয় বিয়ের পর বৈদ্যবাটী ছেড়ে আর কোথাও যাইনি। পাখীর যেমন ডানা কেটে দেয় যাতে সে উড়তে না পারে, তেমনিই আমাকে নানা ভাবে ক্ষুণ্ণ

করেছেন উনি। দিন কতক রাত আটটায় বাড়ী ফিরতেন, আবার কখনো বলা নেই কওয়া নেই, ঠিক ছ'টার মধ্যে হাজির। কোনো দিন দুপুরেই চলে আসতেন। বাড়ীতে থাকলে ভালো, কিন্তু যদি বাড়ীতে না থাকতাম, এমন কি পাশের বাড়ী গেলেও তার জন্ম কঠোর শাস্তি পেতে হয়েছে—

হঠাৎ থেমে আবার দরজার দিকে তাকালেন সীতা দেবী।

"ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে। সব কথা কান পেতে শুনছে, না মুক্তি আমার নেই"

„কিন্তু কই এতটুকু শব্দ নেই, অন্তত: কিছু আওয়াজ পাওয়া যেত।"

"কি বলেন আপনি! একটুকু শব্দ না করে বিছানা ছেড়ে কি ভাবে উঠতে হয় তা উনি জানেন। জানেন, এমন দিন গেছে ভেতর থেকে ঘরে তালাবন্ধ করে শুতে হয়েছে। ক্ষয়গ্রস্ত মানুষের সঙ্গে ঘর করার মত অভিশাপ আর নাই। নিশ্চয়ই দোরের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে—"

উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে সীতা দেবী পরদা সরিয়ে দাঁড়ালেন, বাইরে ফণী সেনের শীর্ণ চেহারা। ঝলঝলে পা-জামা পরে দাঁড়িয়ে আছে ফণী সেন।

"ঘরটায় বড় ফাঁকা লাগছিল, ভাবলাম তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি, তাই—"

প্রতিটি কথা অতি কষ্টে উচ্চারণ করে ফণী সেন, বেশ বুঝি, তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

"আমাকে শুইয়ে দাও—"

আমি তাড়াতাড়ি উঠে ধরতে যাই, কিন্তু তার আগেই পড়ে গেল। আমি তাকে কোলে করে ধরে নিয়ে পাশের ঘরে শুইয়ে দিলাম। আশ্চর্য! শরীরের ভার যেন শিশুর মত। এমনই হালকা হয়ে গেছে দেহ! প্রায় অর্ধমৃত অবস্থা।

প্রশ্ন করলাম—"কি ফণীদা, একটু সুস্থ বোধ করছো ?"

মাথা নাড়লো, একটু ধন্যবাদ দেওয়ার চেষ্টা করলো হয়ত'। তার পর কাশী আরম্ভ হ'ল। ক্ষয়রোগীর কাশীর বেগ এক বার সুরু হলে মনে হয় এইবার বুঝি কাশীর সঙ্গে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। আমার চোখের সামনে মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

পিছন থেকে মৃদু গলায় সীতা দেবী বললেন—"আপনি একটু থাকুন, আমি ডাক্তারকে খবর দিই, পাশের বাড়ীতে বলে আসি, ওরা ডেকে আনবে।"

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। এই বীভৎস কংকালের সামনে দাঁড়াবার সাহস ও সদিচ্ছা আমার নেই। আমার ছাতিটা হাতে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ষ্টেশনের দিকে ছুটতে পারলে খুসী হতাম। আর কখনো বৈদ্যবাটী আসব না, সুন্দরী রমণীর লোভেও নয়।

আমি বললাম—"আমি না হয় ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিই, পথেই ডাক্তারখানা নিশ্চয় ?"

দৃঢ় গলায় সীতা দেবী বললেন—"থাকুন! আপনি না সৎলোক, —চুপ করে বসুন। আমি ডাক্তারকে খবর দিই। এসে পড়েছেন যখন, সব খেলাটুকু দেখুন—"

পর মুহূর্তে মূর্তিমান প্রেতের সামনে সেই নীরব পুরীতে চুপ করে বসে আছি। মনে মনে ভাবছি, কি কুক্ষণেই বৈদ্যবাটীতে পা দিয়েছিলাম। বড়দিনটা বেশ কাটলো। ফণী সেন যদি কথা বলে, সে কথায় কান দেব না। যদি মারা যায় বুঝবো না, কারণ ও-দিকে আমি তাকিয়ে নেই। ও কিন্তু আমার দিকে চেয়ে আছে, বেশ বোঝা যায় আমার মনের কথা ও বুঝেছে।

হঠাৎ মনে হ'ল কি যেন বলার চেষ্টা করছে ফণীদা।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে বললাম—"কি বলছো, বলো আমি শুনতে পাচ্ছি।"

যাই হোক, মনে যতই পাপ থাকুক, চরিত্র নিষ্পাপ না হলেও— আজ ত' আমি সৎ উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। তাই আবার বললাম—"কি ফণীদা কিছু বলবেন ?"

ফণীদার মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। বিছানার চাদরে পানের পীচের মত রক্ত ঝরে পড়ছে।

একটা আঙুল তুললো ফণীদা—আমি তার আঙুলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—সেই রঙ্গন ফুলের গুচ্ছ দেখাচ্ছে ফণীদা।

শেষ পর্যন্ত সীতা দেবীকে রঙ্গিনী রঙ্গন ফুলই হয়ত বলছে,— চন্দ্রমল্লিকার শুচিতা তার আর নেই।

আমি ওকে শান্ত করার জন্য মাথায় হাত দিই। ডাক্তার এসে একটা কোরামিন ইন্‌জেক্‌সন করলো। আর কি সব করলো তা, তপশ্চারিণী সীতা দেবীই জানেন !

ফণীদা কিন্তু এর পরই মারা গেলেন। সেই ফণীদা'কে মনে পড়ে, অফিসের ফণী সেন। ধীর গম্ভীর মোটা গলাবন্ধ কোটে রোগজীর্ণ দেহটাকে ঢেকে সরকারী কাজের কঠোর দায়িত্ব পালন করে বাড়ী ফিরছেন।

সবই মায়া, সবই খেলা। যে বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছি তার থেকে চোখ ফেরানো যায় না। সে আর এক পলায়নী বৃত্তি। তাই তার পর আরো অনেক বার বৈদ্যবাটী গেলাম। যে ঘরে সেই মৃত-দেহ দেখেছি, যেখানে ফণীদার অতৃপ্ত প্রেতাত্মা ছায়াশরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই ছায়াপুরীতে কয়েক রাত কাটিয়েছি। আমার আর সেই 'কিঞ্চিৎ পুণ্যশীলা' রমণীর লজ্জাকর কামনার মূর্তিকে গোপন করে বাইরের দরজায় প্রেতমূর্তি পাহারা দিয়েছে রাতের পর রাত।

চলে এসেছি বৈদ্যবাটীর বাসা তুলে দিয়ে কলকাতায়। শীত কমছে। বসন্ত আসছে। ফণী সেন আর এই বসন্ত দেখবে না। কিন্তু রাতের অন্ধকারে পৌষ মাসের সেই প্রখর শীতের স্পর্শ এসে

গায়ে লাগে, শুভ্রশুচি চন্দ্রমল্লিকা যখন আমার কাছ ঘেঁসে চুপ করে শুয়ে থাকে তখন যেন বাইরের দরজায় শুনি কার চাপা দীর্ঘশ্বাস।

দিন-রাত, পথে-ঘাটে, বাসে-ট্রামে, মানুষ ও মাটির পুতুলের ভিড়ে, সব কিছুর পেছনেই যেন আছে সেই প্রেতের দীর্ঘশ্বাস।

এ আর এক বাতুলতা। এই দীর্ঘশ্বাস থেকে নিষ্কৃতি নেই, মুক্তি নেই, ভেসে চলেছি, কোথায় তা কে বলবে?

কাটা সৈনিক

এই ওয়ার্ডের দেয়ালের আগের বেডটা বরাতক্রমে পেয়েছিল বরুণা সরকার। চমৎকার বেড, চার্জ নার্সের টেবিলের থেকে অনেক দূরে, কিন্তু শেষের বেডটির মত তেমন নিরালা নয়। তবে পাশাপাশি বেডের অধিকারিণীও বেশ ভালো।

যখন কথা বলার বাসনা হয়,—(আর সে বাসনা দিন রাতই হয়) তখন পাশেই আছে লতা মিত্তির। লতা যখন যন্ত্রণায় কাতর বা মন খারাপ করে কাঁদে তখন ও-পাশের বেডের প্রৌঢ়া সেনগিন্নীর সঙ্গে কথা বলা চলে। গীতা, উপনিষদ সম্পর্কে এতখানি জ্ঞান আর কারো দেখেনি বরুণা। প্রতিদিন নিয়ম করে গীতা পাঠ করেন সেনগিন্নী, এই তাঁর আহার, এই তাঁর ওষুধ। আশা বা বিশ্বাস বা অন্য কোন ধরণের চিত্ত-বিনোদক বস্তুতে মানুষ যেমন সব জ্বালা ভুলে থাকে, সেনগিন্নীর কাছে তেমনই শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থং পাঠে বিনিয়োগঃ' শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি কামনায় গীতাপাঠ করেন সেনগিন্নী।

যখন গীতাপাঠ বন্ধ তখন জোড়া বালিশে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকেন চুপ করে। মাথায় একটা রুমাল বেঁধে নেন। হয়ত কিছু দেখতে চান না,—কিন্তু তখন মূর্তি অতিশয় মহিমা মণ্ডিত। বাঁ হাতটি পড়ে থাকে বিছানার চাদরে, হাতের শাদা শাঁখা আর সোনা বাঁধানো লোহাটা বিবাহিত জীবনের জ্বলন্ত স্বাক্ষরের মত উজ্জ্বল মনে হয়। রাজন্যবর্গের পোষাকের জাঁক-জমকের মতো এই অলংকার সেনগিন্নীর মুখে-চোখে অপরূপ গাম্ভীর্য এনে দেয়। এত স্পষ্ট আর পরিষ্কার এই রূপ যে বরুণা সরকারের কাছে তা বেশী বাড়াবাড়ি মনে হয়। সে একটু লঘু ও চপল ধারার পক্ষপাতী। তবু মন খারাপ হলে এই সেনগিন্নীর দিকেই তাকে তাকাতে হয়।

"কি বিশ্রী যে লাগছে দিদিমণি, কি বল্‌বো। সারা জীবনে এতখানি কষ্ট আর পাইনি। মনে হয় কাঁদি গলা ছেড়ে—"

সেনগিন্নী অমনই জবাব দেন—"ঠিকই ত' করো ভাই, কাঁদলে যন্ত্রণা অনেক কমে, ফোড়া কেটে দিলে যেমন ব্যথা মরে, কাঁদলে তেমনই সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়।..."

"জানেন দিদিমণি! গেল বছরও মণ্টু আমার কাছে ছিল, যা আমার ছিল তাতেই ত' আমি সন্তুষ্ট ছিলাম"—

সেই সুরেলা কণ্ঠে সেনগিন্নী আবার বল্লেন, "ঠিক ভাই, সাংখ্য-যোগে শ্রীভগবান বলেছেন অর্জুনকে—যাদের জন্য শোক করা উচিত নয় তার জন্য শোক কেন। পণ্ডিতরা মৃত বা জীবিত কারো জন্যে শোক করেন না। কান্না যদি পায় কাঁদো।"

সেনগিন্নীর সহানুভূতিটায় যদিও সাড়া আছে তবু যেন তা সুদূরের বস্তু। সেই কারণেই যেন তার দাম। যেন বল্‌ছেন...তুমি অসুখী, আমরাও অসুখী, কিন্তু সেইটাই ত' বড়ো কথা নয়, আরো অনেক বড়ো কাজ আছে, জীবন অনেক বড়ো, বৃহৎ-সম্ভাবনার দিকেও তাকাও।

লতা মিত্তির কিন্তু ভিন্ন চরিত্রের। কতই বা বয়স...উনিশ কিংবা কুড়ি। আজ সাতমাস এই ভাবে প্লাস্‌টার এঁটে শুয়ে আছে। বরুণা সরকারের প্লাস্‌টার কাসটিং হয়েছে সবে, তাই বোঝে লতার সহন-শীলতা। মেয়েটা বেশ লম্বা-চওড়া, মুখটা বড়ো, দাঁতগুলি ঝকঝকে এবং সুগঠিত। মাথায় চুলে হয় লাল ফিতা কিংবা প্লাস্‌টিকের ফুল আঁটা থাকে। মাঝে মাঝে রেশমের গুটির নকল ফুলের মালাও বাঁধে। হাস্‌তে ভালোবাসে, যখন হাসে তখন আর রেখে ঢেকে হাসে না, সারা হল কাঁপিয়ে খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ওঠে। বরুণাই তাকে হাসায় অথচ লতার হাসিতে সে যেন চম্‌কে ওঠে এমন ভাণ করে।

লতা চেঁচিয়ে ওঠে, "বরুণাদি, তুমি ভাই ভয়ানক মেয়ে..."

বরুণা বলে, অতো হাসিয়োনা ভাই, আমার এই প্লাস্টারের ছাঁচে অত হাসার জায়গা নেই।'

বয়সে লতার ঠাকুমার বয়সী হলেও বরুণা বলেছিল, আমাকে তুমি নাম ধরেই ডেকো। বরুণাকে যখন এই ওয়ার্ডে আনা হয় তখন কিন্তু তাকে অতি অদ্ভুত মনে হয়েছিল লতার। মাথার কাঁচাপাকা চুল ঢাকার জন্য কলপ দেওয়া হয়েছে, মুখে দু'তিন পোঁচ রঙ চড়ানো, ঠোঁটে লিপ্‌ষ্টিক্। আসল রঙ লজ্জায় দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। ধাড়ীর সখ হয়েছে খুকী সাজার, তাই মুখে পালিশ, ঠোঁটে রঙ, নখে পালিশ। পেন্‌সিল দিয়ে ভ্রু-বানানো।

বরুণা বলে, "জানো লতা, আঠারো বছর বয়সের পর আমার ওজন এক পাউণ্ড বাড়তে দিইনি।"

লতা ভাবে, এ কথার কি কোনো দাম আছে? সারা দেহের মাংস শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে। শরীরের ওজন বাড়লো কি কম্‌লো কি এসে যায়। বয়স বাড়লে বয়স বাড়ে, তাকে কি চেপে ধরে রাখা যায়? নিজের শরীরের কথা ভাবে লতা। এই সুগঠিত তারুণ্য-মণ্ডিত দেহ প্লাস্টারের ছাঁচে আজ সাতমাস বাঁধা। আইনের কঠোর হস্তের মতো কঠিন তার বাঁধন। সবুজ দেয়ালের দিকে মুখ ফেরায় লতা, এই দেয়ালের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি সরু মোটা দাগ তার মুখস্ত। সেই সবুজ দেয়ালের দিকে চেয়ে চোখে জল ভরে ওঠে।

বরুণা চাপাকান্নার আওয়াজ শুন্‌তে পায়। "ঐ দেখ, খুকীর আবার কান্না সুরু হ'ল। তোর মতন এমন কাঁচা বয়স কি কান্নার বয়স? এই বয়সে কান্না কি মানায়? হ'ল কি তোর?"

গভীর বেদনায় বিছানায় ছট্‌ফট্ করে লতা, তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে—"বরুণাদি, সারাজীবন কি কেউ কারো অপেক্ষায় থাকে? ওরা পুরুষ মানুষ, অসুখ ওরা ভালবাসে না, সুখের মুখের পানে চেয়ে থাকে। হাসপাতালের রোগীভরা ওয়ার্ড কি ওদের ভালো লাগে? আমি দোষ দিইনা ওদের। গেল মাসে একবার

এসেছিল সেই সঙ্গে ওর মাও এসেছিল। নিশ্চয়ই ওর মা-ই জোর করে টেনে এনেছিলেন। নিজে আসার ছেলেই নয়। আর হয়ত আস্‌বে না কোনোদিন। দেখে নিও তুমি।"

বরুণা মৃদুগলায় পরম প্রীতিভরে বলে, "শোনো খুকী, আমি বল্‌ছি—এই মুহূর্তে তোর কথাই ভাবছে সে। কতকগুলো ব্যাপারে আমার জ্ঞান অদ্ভুত, যাকে বলে সাইকিক্ বা আধিভৌতিক ক্ষমতা। যেখানেই থাক্ তোর অশেষরঞ্জন, এই মিনিটে সে তোর কথাই ভাবছে। কিন্তু এ ছাড়াও আরো শিকার তোর জালে বাঁধা, কাল দেখিস্‌নি ডাঃ মৈত্রকে? কি ভাবে তোর দিকে তাকিয়েছিল, যেন গিল্‌ছিল।"

লতা এমন নির্বোধ নয় যে এই সব কথা সে বিশ্বাস করবে, তবু সাময়িক প্রক্ষেপ হিসাবে মন্দ নয়। হাসি ফুটে উঠলো লতার মুখে, একটা হাসি। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছলো লতা মিত্তির। যাই হোক্ বরুণা সরকারের বুড়ো হাড়ে মায়া মমতা আছে।

বয়সের এই পার্থক্যটা বেশীদিন কিন্তু আর রইলো না। নার্স এবং অন্যান্য রোগীণীদের সম্পর্কে সর্বদা ফিস্‌ফাস্ করে, হাসাহাসি করে, স্কুলের সহপাঠিনীদের মতো। এমনকি ডাক্তারদের সম্পর্কেও রসিকতা করতে বাধে না। ডাক্তারেরা অবশ্য এই ওয়ার্ডে যখন উপস্থিত থাকেন তখন লতা বেশ শান্ত ও সমাহিত হয়ে থাকার চেষ্টা করে।

বৃহস্পতিবার ডাক্তারদের দিন। ঠিক দশটায় এই ওয়ার্ডে সবাই এসে হাজির হয়। চার্জ-নার্স মালতী চৌধুরী মোটা শরীরটা নিয়ে ওপর নীচে ছুটোছুটি করেন, যারা এপ্রেন্টিস্ তাদের পোষাকের দিকে কড়া নজর আর নজর নিজের রিষ্টওয়াচে।

ঠিক দশটায় লিফটের আওয়াজ শোনা যায়। দরজা খুলে যায়, বন্ধ হয়। তারপর করিডোরে অনেকগুলি পায়ের শব্দ। একদল ডাক্তার হলে এসে হাজির। রোগীদের বুকের বল বাড়ে। এদের পুরো-ভাগে থাকেন ডাঃ দত্ত, বিশাল চেহারা, পাকা দাড়ি, দেখলেই ভক্তি

হয়, তাঁর পিছনেই থাকেন ডাঃ মানস মজুমদার; তিনি রেসিডেন্ট সার্জেন। আর থাকে এক গাদা ছাত্র ছাত্রী ও নতুন ডাক্তারের দল।

প্রতিটি বেডের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার দত্ত এক্স রে প্লেটটা আলোর দিকে তুলে ধরেন, প্লেটের ওপর তাঁর যে গভীর মনোযোগ সেই দৃষ্টি কিন্তু রোগীদের ওপর দেখা যায় না। বলেন, "এই দেখ, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে bony proliferation of the greater trochanter—"

পক্ষঘাতগ্রস্ত শশক শাবকের মত রোগিণী নিঃশব্দে বিছানায় শুয়ে সব দেখে, কান খাড়া করে থাকে কোনো বোধগম্য কথা শোনা যায় কি না।

—"দেখছো এইখানটায় articulating portion of the femur-এ slight subluxation এখনো একটু রয়েছে।"

ডাক্তারদের এই সাপ্তাহিক অভিযান সকলে সতৃষ্ণ নয়নে দেখে।

সবাই কানাকানি করে—ডাক্তাররা নিজেরাই কথা বলে, আমাদের কিছুই বলে না। একটু কিছু ত' বলা উচিত।

একমাত্র বরুণা সরকারই সাহস করে দু' এক কথা বল্‌তে পারে। চুপ করে ধূসর রঙের চাদরটা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে বরুণা, মিটিমিটি চেয়ে দেখছে। ডাঃ দত্ত যখন পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন তখন বরুণা বলে উঠ্‌ল—"ডাক্তার দত্ত, আপনি বলেছিলেন বেশী দিন লাগবে না, এদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুমাস কেটে গেল।"

"তাই নাকি! তা বেশী দিন আর লাগবে না। কি যেন নাম, মিসেস্—"

"মিসেস্ সরকার। বরুণা সরকার। যতবার আসেন ততবারই ত' নাম বলি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিসেস সরকার। বেশী লাগার ত' আর কথা নয়।"

"এড়িয়ে যাচ্ছেন ডাক্তার দত্ত, মেয়েদের বুঝি সত্য কথা বলতে নেই?"

ডাক্তাররা চলে যাওয়ার পর লতা বলে, "বাঃ, আচ্ছা মেয়ে তুমি বরুণাদি, কি করে যে অত কথা বলো। আমাদের মুখের দিকে ডাক্তার যেই তাকান তখনই মনে হয় জিভটা যেন আলুভাতে হয়ে গেছে।"

বরুণা এক গাল হেসে বলে, "এতকাল সিনেমা, থিয়েটার ঘুরে এসে এটুকু কথা বলতে পারবো না তবে আর কি করলুম! তা ছাড়া পুরুষ মানুষ আমি খুব চিনি ভাই। জানিস্ ত' দুবার বিয়ে হয়েছিল আমার। প্রথমবারের স্বামী ছিলেন মারাঠি। অনেক দেখে শুনে হাড় পেকে গেছে আমার।"

লতা এই নিয়ে অন্তত হাজারবার দুটি স্বামীর গল্প শুনেছে। আজ আবার শুনলো। প্রথম স্বামীর সঙ্গে সারা য়ুরোপ টুর করেছে। তারপর পুণায় থাকার সময় কি নিয়ে এমন গোল বাঁধলো যে সোজা সিনেমার পর্দায় গিয়ে উঠলো বরুণা। বেচারী বোরওয়ানকার এতদিনে হয়ত মারাই গিয়েছেন স্ত্রীর শোকে।

বর্তমান স্বামী অবিনাশ সরকার। চেহারা যেন গ্রীক দেবতা এ্যাপোলোর মত। প্রথম দর্শন বাসে,—উনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন লেডীজ সীট ছেড়ে দিয়ে, তারপর সেই প্রথম দর্শনেই প্রেম। আপাদ মস্তক প্রেম সমুদ্রে ডুবলো। সুন্দর চোখ আর চমৎকার চুল। ধনুকের মত জোড়া ভুরু।

তখন কোন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের দালালী করতেন, পরে কিছুদিন একটা সরকারী কাজও। তারপর সব ছেড়ে বরুণার টাকায় বড়মানুষী আরম্ভ হ'ল। বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে মদ খেতে সুরু করলো। লতাকে উপদেশ দেয় বরুণা, "জানিস লতা, কখনো পুরুষের সুন্দর চেহারা দেখে বিয়ে করিস নি, ঠকতে হবে। তোর গলায় একটা পোষ্য চাপবে। তবু বারো বছর মুখ বুজে সব সয়েছি। সেবার বম্বে থেকে ফিরে এসে দেখি মুখখানা পাঁউরুটির মত ফুলে উঠেছে, আর মাথায় বেশ গোল টাক পড়তে সুরু করেছে। তবু ভাই সব সহ্য করেছি, বরং বোরওয়ানকার লোকটা ছিল ভালো। একটি কথা ছিল না মুখে—"

ওপাশ থেকে সেনগিন্নী বলে ওঠেন, "যা কিছু চোখে দেখো ভাই সবই অনিত্য, মায়া। যা চোখে দেখা যায় না তাই নিত্য-কালের ধন।"

"সে কথা হয়ত সত্যি দিদিমণি, কিন্তু যতক্ষণ স্মৃতিশক্তি থাকবে ততক্ষণ জ্বালায় জ্বলতে হবে। তারপর মণ্টু চলে গেল। কোনো রকমে ওটাকে নিয়েই ছিলুম সব দুঃখ ভুলে। কিন্তু শাস্তি কি একটা, পুজোর সময় বাস থেকে নামতে গিয়ে পাটা গেল। তারপর এই শুয়ে আছি—।

"কোনো ভয় নেই, আবার সব হবে।" সেনগিন্নী গম্ভীর গলায় বলে ওঠেন।

লতা কিন্তু বলে ওঠে, "এমন ভাবে কথা বলো বরুণাদি যেন পুরুষ মানুষরা পোকা-মাকড়ের সামিল। তোমার আর কি, কত তোমার বন্ধু-বান্ধবের ভীড়, কত দেখেছ কত পেয়েছ তবু এত জ্বালা। আর আমার মোটে একটি তাও দুখানি চিঠি পর পর দিলুম, একটারও জবাব এলো না।"

"বোধহয় চিঠি দুখানি খুব পিঠ পিঠ দিয়েছিলি? চিঠিতে কি ইনিয়ে-বিনিয়ে কত কষ্ট হচ্ছে, নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখ এই সব লিখেছিলি?

"হ্যাঁ, অনেকটা ঐ রকম।"

"ওরে পুরুষ মানুষকে জানতে দিতে নেই যে তোমার প্রেমে আমি হিমসিম্ খাচ্ছি। এ সব গোপন রাখতে হয়। গোপন কথাটি গোপনে রাখবে। এ তোকে কেউ শেখায় নি? বংশে যদি কেউ পাগল থাকে তা যেমন লুকিয়ে রাখতে হয় প্রেমে পড়লে সেটাও তেমনি গোপন রাখতে হবে। এমন কি পাকা ঘুঁটি জানলেও বলবি না। সমস্ত মন প্রাণ যদি সমর্পণ করিস তা হলেও বিপদ, ছোট ছেলের হাতে লজেন্স দেওয়ার মত অবস্থা হবে। একমনে সেটা চুষতে সুরু করবে আর শেষ হওয়ার পর কিছুই মনে রাখবে না।

আমি তোকে বলি—"

বরুণার মাথার চুলগুলি হাওয়ায় উড়ছে, যেন ডাইনীর মত চোখ দুটো তার জ্বলছে, পরমোৎসাহে বরুণা বললে—"আমি বলি কি ওদের একটু ক্ষিধে রেখে দিবি—"

লতা যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। সে সরল ভাবে প্রশ্ন করে, "তাহলে কি চোখের সামনে খাবার রেখে খেতে দেব না?"

"ঠিক বলেছিস্, এর পর যখন চিঠি লিখবি আমি তোকে বরং সাহায্য করবো। কি যে লিখতে হবে আমার ভালো জানা আছে। তলায় লিখবি 'স্নেহাকাঙ্ক্ষী'। সব পুরুষ মানুষ ঐ কথাটির উপর ভীষণ চটা। ওর মানে যেন কোন ভবিষ্যৎ নেই আর—ঐ খানেই ইতি। আর দু একবার চিঠির ভেতর নেহাৎ অপ্রয়োজনীয়ভাবে ডাক্তার মৈত্রর নামটা দিয়ে দিবি। আমি আর তোকে কি শেখাব?"

"না না, তুমি একটু সাহায্য কোরো বরুণাদি।"

বালিশে মাথাটা চেপে শ্রান্ত বরুণা চুপ করে শুয়ে থাকে। মুখে তার মৃদু হাসি। মৃদু গলায় বরুণা বলে—"পুরুষমানুষ! আমার ঢের দেখা আছে ভাই। ঐ যে ডাঃ দত্ত, অত বয়স, তবু কিরকম প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে থাকেন দেখছিস্, তবু ত' আমার চুলগুলো শাদা হয়ে এসেছে—"

"ওঃ বরুণাদি, তোমার মুখে কিছুই আটকায় না ভাই।

"কি আবার! আমার স্পষ্ট কথা, ভেতরে একরকম বাইরে একরকম পারি না। বোরওয়ানকর বলতো—"

বোরওয়ানকর, বোরওয়ানকর, শুনে শুনে কান ক্ষয়ে গেল লতা মিত্তিরের। যদি সমীর সামনের ভিজিটরস্ ডে' তে আসে ভালো হয়।

ভিজিটরস ডে' তে হাসপাতাল গম্ গম্ করে, যেন উৎসব সুরু হয়েছে। কাগজের ঠোঙার খস্ খস্, শাড়ির ফর্‌ফরানি, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রাও লৌকিকতা রক্ষার জন্য খালি হাতে আসেন না।

এই রকম একদিনে সেন মহাশয় এলেন। বয়স হয়েছে, বেশ লম্বা ধরণের চেহারা। মাথার চুলগুলি সব শাদা। চোখে মোটা কাচের চশমা। কোনদিন তিনি সেনগিন্নীর বিছানার পাশে বসেন না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। বরুণা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওঁদের শান্ত কথাবার্তার টুকরো শুনতে পায়।

অন্যদিকে বিরামবিহীন আলোচনা। লতা মিত্তিরের ভিজিটরের সংখ্যা খুব বেশী। মাসতুতো বোন, পিস্‌তুতো ভাই, পিসিমা, বৌদি, ভাইপো—ও একটা বিরাট পরিবার বটে। যে অফিসে লতা চাকরী করে সেই রেল অফিসের মহিলা সহকর্মীর দল। লতার মা আসেন, অনেকদিনের পুরানো এক গরদের শাড়ি পরে। যেন কালীঘাটে এসেছেন। দাঁতগুলি এখনও লতার মতই পরিস্কার। কখনো খালি হাতে আসেন না। হাতে তৈরী সন্দেশ আর কমলালেবু ঠোঙার ভেতর থেকে বার করেন। যখন বরুণার দিকে লক্ষ্য পড়ে তখন মৃদু হাসেন, কুশল প্রশ্ন করেন। মেয়ের জন্য আনা ফল, মিষ্টির কিছু ভাগ দেন।

হাত বাড়িয়ে নেয় সব বরুণা। হেসে বলে "এমনই বরাত মাসিমা আমার, আপনার লোক সব বিদেশে। কেউ দিল্লী, কেউ রাঁচী। আর এই এ্যাক্‌সিডেন্টের খবর দিয়ে তাদের জ্বালাতন করতে ইচ্ছে হয় না। সবাই জানে আমি বেশ আছি, আনন্দে আছি।"

ভিজিটরস্‌রা চলে গেলে যখন চারদিক শান্ত হয়ে যায় তখন আর ব্যথা চাপা যায় না। তখন সেনগিন্নীর বিছানার দিকে পাশ ফেরে বরুণা। বলে—"কি বিশ্রী যে লাগছে দিদিমণি কি বলব! দিনরাত একা একা আর ভালো লাগে না।"

"ছিঃ বোন, মন খারাপ করতে নেই, এ সংসারে কেউ একা নয়, ঈশ্বর সর্বদা সঙ্গে রয়েছেন। এই ধরো মাথার চুল যেমন, প্রত্যেকটি আলাদা কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গে মিল রয়েছে, আমরাও তেমনই এক

বিরাট মাথার চুলের মতো। মনে কত চিন্তার উদয় হয়, আবার মিলিয়ে যায়। কোনটাই কিন্তু আলাদা নয়। কেউ একা নই আমরা, কেউ নয়।"

মাথা নেড়ে বরুণা বলে "বুঝেছি। বোঝেনি সে কিন্তু কিছুই। এই নিঃসঙ্গতার দুঃখই তখন তার জীবনের পরমতম সত্য বলে মনে হয়। এই শূন্যতা যেন রবিবারের বিষণ্ণ বিকেল। সামনের ব্যারাকের রেডিয়োর কর্কশ চীৎকারের মতো অর্থহীন। মধ্যরাত্রে যখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় তখন যেমন সারা পৃথিবীটার অস্তিত্ব মুছে গেছে মনে হয়, বরুণার জীবনের সমস্ত ভূত, ভবিষ্যৎ আর বর্তমান তেমনই কোথায় মিলিয়ে গেছে। নার্সিং হোমের এই বিছনায় পড়ে থাকাটা বুঝি সত্য আর সব মিথ্যা।

তবে এই অবস্থাটা সন্ধ্যার পর অনেকটা কেটে আসে। রাতের খাওয়াটা বেশ তৃপ্তি করে খায় বরুণা। লতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, "আর যাই হোক লতা, এখানকার রাঁধুনীর হাতের গুণ আছে। খেয়ে খেয়ে দেখছি মোটা হয়ে যাবো শেষটায়। কাল মাংসটা কেমন হয়েছিল বল দেখি।"

সেদিন কিন্তু 'ভিজিটরস্ ডে' নয়। হঠাৎ লতার সেই বন্ধু অশেষরঞ্জন এসে হাজির। এতদিনে তা হলে এল। শীত কেটে এসেছে, ফেব্রুয়ারীর গোড়া—অশেষরঞ্জন অবশেষে এল।

এতকাল পথ চেয়ে আর কাল গুণে থাকার পর ফাল্গুনের সুরুতে আশা এরকম ছেড়ে দিয়েছিল লতা। এখন মুখের হাসি চেপে চুপি চুপি বরুণাকে বলে—"বরুণাদি, এই আমার অশেষ আর আজই সেই ভালো ব্লাউজটা পরা হয়নি।—" উত্তেজনা ও আনন্দে তার মুখে চোখে যেন সব রক্তএসে জমেছে।

বরুণা লক্ষ্য করলো পাতলা গৌরবর্ণ চেহারা, নাকটা বেশ তীক্ষ্ণ চোখটা বড়, দুটি টানা ভ্রূ। বরুণা চালাক মেয়ে, বড় বোনের মত

উপদেশের ভঙ্গীতে বলে : "অত নার্ভাস হলে চলবে না,এখন থেকেই যে লজ্জায় লাল। আর দেখ্ হ্যাংলার মতো গলে পড়িস্‌নি যেন। বেশ সহজ ভাব দেখাবি, যেন কালই তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

লতা মৃত্যু গলায় বলে, "বেশ, তোমার কথাই মেনে নিলাম।" এতক্ষণে অশেষরঞ্জন একেবারে বেডের কাছে এসে পড়েছে। লতা মুখে হাসি টেনে বলে—"এই যে, কি মনে করে?" নেহাৎই সৌজন্যসূচক উক্তি।

"তারপর লতা, খুব রেগে আছো নিশ্চয়ই। আরো আগে আস্‌তাম, পরীক্ষা আর পরীক্ষা। এর মধ্যে দুটো পরীক্ষা হয়ে গেল। সত্যি বল্‌ছি উপায় ছিল না।"

"তা বেশ করেছ, আমি কি আর অত আশা করতে পারি?" তার কথার ভঙ্গীতে বিস্মিত হয় অশেষ।

"তাহ'লে আমার জন্য তোমার মন খারাপ হয়নি বলো?"

"তা হয়েছে, প্রতি দিন, প্রতি রাত তোমার কথা ভেবেছি।"

"অন্ততঃ তোমার চিঠি পড়ে ত' তাই মনে হয়েছে।"

"তখন সারাদেহে কি যন্ত্রণা, প্লাস্‌টার এঁটে দিনরাত শুয়ে থাকতে যেন শত্রুকেও না হয়।"

বরুণা মিষ্টি মিষ্টি হাস্‌ছে। অশেষের মুখে লতার কথার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে আনন্দ পায়।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে অশেষ প্রশ্ন করে, "এ আবার কি ফ্যাসান তোমার চুল বাঁধার, মারাঠী না মাদ্রাজী?"

"কেন ভালো লাগ্‌ছে না?" লতার মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ও বেড থেকে বরুণা বলে ওঠে, "ডাঃ মৈত্র যে ঐ রকম খোঁপাই পছন্দ করেন।"

"তুমি থামো বরুণাদি। তোমার মুখের আগ-ঢাক্ নেই।" ভারী হয়ে উঠেছে লতার কণ্ঠস্বর।

বরুণা থাম্‌বার পাত্রী নয়, আবার বলে, "লতা হল এই নার্সিং-হোমের আদরের খুকী। সবাই ওকে ভালোবাসে।"

অশেষের চোখে একটা অদ্ভুত ভঙ্গী ফুটে উঠেছে। সে প্রশ্ন করে—"এই ডাক্তার মৈত্রটি কে ?"

বরুণাই জবাব দেয়—"এখানকার রেসিডেণ্ট সার্জেন !"

অশেষের মনটা ভার হয়। লতা সেই বিশ্রী পরিস্থিতি কাটাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে।

অনেক পরে লতার শিয়রে চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর অশেষ সহসা প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, তোমার সেই বরুণাদি কোন্‌টি ? রিলিজ হয়ে গেছে ?"

লতা অতি মৃদু গলায় বলে, "ঐ ত' পাশের বেডে, বুঝতে পারলে না ? তুমি একটি বোকারাম !"

"ঐ বুড়ো ধাড়ী !

"ছিঃ, অমন করে বলতে নেই। মানুষটা ভারী ভালো। একটু মিষ্টি কথার কাঙাল। না থাকলে কি যে করতাম, কি করে যে দিন কাটতো।"

"তা ত' বুঝলাম, কিন্তু এদিকে যে গঙ্গাযাত্রার বয়স হয়েছে।"

"চুপ করো, বলছি না আমাকে ভারী ভালোবাসে, শুনতে পাবে যে।" প্রাণপণে বরুণার প্রশংসা করে যায় লতা। এতটুকু কটু ইঙ্গিত তার সইবে না।

—"এর নাম তোমার বরুণাদি, বুড়ো বয়সে কত ঢঙ দেখ।"

"বলছি না চুপ করো, জানো উনি আমাকে ভারী ভালোবাসেন।"

তখন লতা বরুণার নিন্দা এতটুকু সহ্য করেনি কিন্তু অশেষরঞ্জন চলে যাওয়ার পর বরুণা যখন ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে অশেষ-চরিত্র বিশ্লেষণ করতে সুরু করলো, মেয়েদের নিজস্ব ভঙ্গীতে নানা ত্রুটি আর বিচ্যুতি একে একে বল্‌তে থাকে তখন লতা অতিশয় বিরক্তিভরে

চুপ করে রইল। আর যাই হোক, এইভাবে মুখে রঙ মেখে খুকী সাজার কোনো মানে হয় না। এই বয়সে এত সাজলে সবায়ের চোখেই খারাপ ঠেকে।

কিন্তু আজ সে আনন্দে আছে শান্তিতে আছে, মনের আনন্দ তার সব অশান্তি মুছে দেয়।

অবশেষে লতা প্রশ্ন করে, "কেমন দেখলে বরুণাদি.?"

"তা, মন্দ কি! ভালোই ত'। তবে একটু সাবধানে নাড়াচাড়া করিস। একটু মেজাজী ছেলে। মান-অভিমান বেশী।"

"আজকের অভিনয় কি রকম করেছি বরুণাদি?"

"বেশ হয়েছে, ঠিকই করেছিস্। প্রত্যেক প্রেমের ব্যাপারে এমন একটা সময় আসে যে তুমি হয় তাকে জয়মাল্য দিয়ে বুকে টেনে নিতে পারো, নয় গলা টিপে মারো। একটা কথা, এতটুকু মান-অভিমান সব ভেঙে চুরমার করে দেয়। আমার একবার এই অবস্থা হয়েছিল, আমরা তখন থাকি নাসিকে, সেখানে অরবিন্দ দেশাই বলে একটি ছেলের সঙ্গে ও সে কি ভাব, একেবারে যখন হাবুডুবু খাচ্ছি তখন একদিনের একটা কথায় সব ভেঙে গেল, তা ছাড়া তখন থেকেই আমি মনে মনে বোরওয়ানকারকে ঠিক করে ফেলেছি।"

আবার বোরওয়ানকার! পৃথিবীটা এখন অশেষরঞ্জণে পরিপূর্ণ। এই ছোট পৃথিবীতে আর ঐ পচা বোরওয়ানকার কথাটুকুরও স্থান নেই। দত্তাত্রেয় বামন বোরওয়ানকার নাম শুনে শুনে কান পচে গেছে।

বরুণা আবার বলে, "আজ যা বুঝেছি তা এই, তোদের এই প্রেম অক্ষয় হবে। এর আর শেষ নেই।"

"ঠিক বলছো বরুণাদি?"

লতার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কে যেন তার কান ধরে টানছে। পাশের কলঘরে কে কলটা খুলে রেখেছে, অনর্গল জল পড়ছে। যেন এক সুমধুর সঙ্গীত। নার্সিং হোমের বিরাট জানলাগুলি যেন আকাশের এক ফালি কেড়ে ঘরে এনেছে। যা কিছু কুৎসিত সব আজ

সৌন্দর্যে ভরে উঠেছে, মাধুরী ছড়িয়ে আছে চারদিকে। সামনে পড়ে আছে ভবিষ্যৎ, সেই অল্প পরিসর স্থানটুকুতে অশেষ আর লতা কোনো রকমে একটু জায়গা করে নিয়েছে, আর ফাঁক নেই।

ধীরে ধীরে দীর্ঘ শীতের দিন বসন্তে পরিবর্তিত হল। এমন কি এই নার্সিং হোমের ডেটল, আয়ডোফরম, আর আইডিন মিশ্রিত গন্ধও যেন বসন্তের কোমল স্পর্শে সুরভিত হয়ে উঠেছে। কার্ণিসে আর কড়িকাঠে পায়রাগুলো গলা ফুলিয়ে দিনরাত বক্ বকম করছে, কখনো মুখোমুখি বসছে, কখনো পিছু নিচ্ছে সঙ্গিনীর। লতার মাসতুতো দিদি সেদিন খবরের কাগজে জড়িয়ে কয়েকটা লাল গোলাপ এনেছিলেন। কাঁচের গ্লাসে সেইগুলি সাজানো আছে, শূন্যদৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রইলো লতা।

কালের যাত্রার বিরাম নেই। তার রথ অবিরাম গতিতে ছুটে চলেছে। হুইল চেয়ারে বসে সুশীলা মাসিমা বাড়ি ফিরে গেলেন। রমা মজুমদার, সাত নম্বর বেডের বোকা গোলগাল মেয়েটা তার মার সঙ্গে চলে গেল। মেয়েটাকে দেখতে অতো খারাপ হলে কি হয় তার এই রোগমুক্তিতে নার্সিং হোমের সবাই খুশী। তার সরল চরিত্র সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। বুড়ি কাশীর দিদিমণির বেডটা একদিন পর্দা দিয়ে ঘিরে দিল। তারপর আর তাকে দেখা যায়নি। বাইরে খোল খরতালের আওয়াজ আর হরেকৃষ্ণ হরেরাম শোনা গেল। সেনগিন্নী বললেন "আহা, কাশীর দিদিমণি পুণ্যাত্মা ছিলেন, আজ চতুর্দশী, বড় ভালো দিন।

নতুন রোগিনীরা আসছে কারো পোলিও, কারো অষ্টিয়োমায়েলাইটিস্ কারো পাঁজরা খারাপ, কারো শিরদাঁড়া, কোনো বৃদ্ধার আরথারাইটিস, কারো হাড় ভেঙেছে।

বরুণার প্লাসটার খোলা হয়েছে। ড্রেসিং রুমে নার্স মিসেস নাগ নিজে খুলেছেন। প্লাসটার কাটবার যন্ত্রটা তোতাপাখির ঠোঁটের মত দেখতে। কি বিশ্রী আওয়াজ।

বিছানায় ফিরে এসে বরুণা সরকার বলল—"আজ যেন আমি খোসা ছাড়ানো চিংড়ি মাছ।"

"তোমার কপাল ভালো বরুণাদি।" লতার কথায় তিক্ততা ছিল। আজ এগারো মাস সে শুয়ে আছে, ভরা যৌবন, সারা অঙ্গে প্লাস্টার এঁটে। আর বুড়ি বরুণার চার মাসের মধ্যে ছুটি হয়ে গেল। এ কি এক চোখোমি বিধাতার।

বরুণা বুঝি বুঝতে পারে তার মনের কথা, বলে, "আমাকে যেন হিংসে করিস্ নি লতা। আমার জীবনের ত' শেষ পরিচ্ছদ, তোর ত' সবে ভূমিকাটুকু ফুরিয়ে এল। সারা জীবন বাকী, কত আনন্দ। কত বিচিত্র স্বাদ পাবি জীবনের।"

ক্ষমা করে লতা বরুণাকে। অশেষরঞ্জনের গাম্ভীর্যভরা হাসিখুসি-মাখা মুখখানি মনে পড়ে। তার অশেষ আছে। এ কি কম আনন্দ!

গরমের দিন এল। ছাত্রের দল হাফসার্ট পরে ঘুরছে, রুমালে মুখের ঘাম মুছচে, বাগান থেকে কত নাম না জানা ফুলের মধুর গন্ধ ভেসে আসছে। স্তব্ধ প্রখর গ্রীষ্মের দিন। ধরণী মূর্চ্ছাহত। বরুণার ক্রমশঃ উন্নতি হচ্ছে, লতা মিত্তির ছটফট করছে।

বৃহস্পতিবার ডাক্তার সাহেব নিজে বরুণা সরকারের পা পরীক্ষা করলেন। বললেন···"আপ, আপ। টেল মি হোয়েন ইট হার্টস।"

বরুণা সরকারের সাহস অনেক। সে বলল, "আপনি দেখুন না, আমার লাগছে না একটুও···"। এতগুলি ডাক্তার তার সামনে দাঁড়িয়ে, মন্দ লাগছে না বরুণার।

পা নামিয়ে রেখে ডাক্তার সাহেব বললেন, "ইউ আর এ গুড স্পোর্ট। নিশ্চয় খুব লেগেছে। সব মেয়েরা কিন্তু তোমার মত নয়। একটুতেই কেঁদে ওঠে।"

"আপনার মত ডাক্তার ক'জনের কপালে মেলে?

অনেক পরে ভীড় কমলে লতা বলেছিল, "বলিহারি মেয়ে তুমি

বরুণাদি। বাবাঃ, কেমন চুপ করে ছিলে। ডাক্তার সাহেবের তোমাকে পছন্দ হয়েছে বোধ হয়।"

জান্‌লা খোলা আছে। গরম বাতাস আর ফুলের গন্ধ সেই পথে ঘরে আসছে। লতার কথা শুনে বরুণার পুরনো মন জেগে উঠেছে। সে বলল, "আমারও ত' তাই মাঝে মাঝে মনে হয় লতা।"

সেদিন সন্ধ্যায় এই ওয়ার্ডের সব পেসেণ্ট আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছিল যে বৃষ্টি হবেই। প্রতিটী বেদনার্ত ভাঙা হাড়ে এই আনন্দ সংবাদ প্রতিধ্বনিত। মধ্যরাত্রে বৃষ্টি নামল, সেই সঙ্গে কালবৈশাখীর তাণ্ডব। বিদ্যুতের আলো জানলার পথে ঘরে এসে পড়ে আবার মিলিয়ে যায়। রাতের নার্স ফুলরেণুদি'র ঠোঁট কখনো নড়ে না— আজ তার টেবলের কাগজ উড়ে গেল। তাড়াতাড়ি তার পিছনে ছুটেছেন তিনি। যে তরুণ ডাক্তারটির নাইট ডিউটি, তিনি চাপরাশি নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন, সার্সির পাল্লা বন্ধ করছেন নিজের হাতে। পরম প্রশান্তিতে সেন গিন্নীর নাক ডাকছে, ছন্দায়িত নাসিকাগর্জন। লতা ঘুমের ঘোরে কি যেন বিড়বিড় করে বলে। বরুণা সরকারের কোমরের যন্ত্রণা বেড়েছে, চুপ করে শুয়ে সে এই-সব দেখছে। দেখছে ঝড় আর জলের উদ্দামতা। কিসের কি তা ভুলে গেছে, এ সবই যেন তার জীবন-নাট্যের অংশ বিশেষ। সেনগিন্নী কেমন ঘুমিয়ে আছেন।

এক সপ্তাহ ধরে এই ভাবে খারাপ আবহাওয়া চললো। প্রতিদিন ঝড় জল। পেসেণ্টরা ঝগড়া করে খুঁটিনাটি ব্যাপারে, ক্ষমা আর শালীনতা সাময়িক ছুটি নিয়েছে। লতা বরুণাকে দু' কথা শুনিয়ে দিয়েছে, বরুণাও ছাড়ে নি। সেনগিন্নী গীতা পড়ছেন আরো বেশী সময় ধরে। নার্স বেলাদি রাতের খাবার দেওয়ার সময় আর্দালী হরিচরণকে এমনই ধমক দিলেন যে সে সব রেখে পালাল, বেলাদি সিঁড়ি পর্যন্ত ছুটলেন তার পিছনে।

বেদনাভরাচিত্তে বরুণা মনে মনে ভাবে এই সময় যদি আমাকে ক্রাচেস্‌টা দিত, তাহ'লে ঐ জানলার ধারে গিয়ে লাফিয়ে নীচে পড়তাম। ডাক্তার সাহেব কিন্তু ক্রাচেস্‌ দিলেন তার পরের সপ্তাহে। ইতিমধ্যে আবার সূর্য উঠছে নিয়ম করে, জল ঝড় কমে গেছে। এখন আর বরুণার নীচে লাফিয়ে পড়ার বাসনা নেই। ক্রাচেস্‌ ধরে এই ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়ানো যেন এক বিচিত্র নাচের ভঙ্গী। দুটো কাঠের লাঠি তার নৃত্য সঙ্গী। এখন সে স্বচক্ষে দেখে মিসেস বোসের মাথায় টাক, আর দীপ্তি চৌধুরীর অমন সুন্দর হাসি সারারাত একগ্লাস জলে ভেজানো থাকে। কাঁচের গ্লাসে বাঁধানো দাতগুলি যেন বিদ্রূপ করছে।

বেড নম্বর নাইনে যে বিগত যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী কনকলতা শুয়ে আছেন তা জানা ছিল না বরুণার। আলাপ হয়ে গেল এক মুহূর্তে। আর যাই হোক দুজনেই আর্টিষ্ট। এই ওয়ার্ডের আর সব রোগিণীর চেয়ে ওরা বিভিন্ন। কত দেখেছে। কত অভিনয়ে জয়মাল্য পেয়েছে। সামনে হাততালি ও ফুলের মালা আর রঙ্গমঞ্চের পিছনে যত আবর্জনা আর অন্ধকার। ছিন্ন, দুর্গন্ধ পোষাক পরে রাণীর পার্ট করেছে, মুখে গ্রীজ পেণ্ট মেখে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে ঘেমেছে।

কনকলতা বলছিলেন, "তখন শরীরটা কি ছিল, এই পা নাচের সময় মাথার ওঠাতে পারতাম, আর এখন, মাংসপিণ্ডের মত পড়ে আছি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বরুণা বলে—"বুঝি দিদি, আমিও ত' নেচেছি এককালে।"

অতীতের স্মৃতিতে স্তব্ধ হয়ে থাকে দুই প্রাচীনা অভিনেত্রী। অনেকক্ষণ পরে স্তব্ধতা ভেঙে বরুণা প্রশ্ন করে—"আপনার হাঁটুর যন্ত্রণা আজ কেমন?"

"ভালো কথা, ঐ দেখ সব ভুল হয়ে যায় আজকাল। আমিও ভাবছিলাম তোমার কোমরের ব্যথাটা কেমন আছে?"

পরের বৃহস্পতিবার ডাক্তার সাহেব ক্রাচেস্ সরিয়ে নিয়ে বল্লেন —"একটু হাঁটো দেখি।"

"হাঁ ট বো ?"

"ভয় কি! সেরকম দেখলে ধরে ফেলবো।"

ওয়ার্ডের সবাই বরুণা সরকারের হাঁটা দেখছে। নিজেদের যন্ত্রণা কারো মনে নেই। তুটি পা কাঁপছে বরুণার। আজ আবার যেন সবপ্রথম ষ্টেজে নামছে। তু এক পা গিয়ে থামে বরুণা, ডাক্তারের মুখের পানে তাকায় সলজ্জ ভঙ্গীতে। লতা আজ বরুণার মুখে শিশুর সারল্য লক্ষ্য করছে। বরুণার মনে হয় নিজেই বাহবা দেয়—"বাঃ, বরুণা বেশ হচ্ছে।"

লতা প্রতিধ্বনি করে বলে—"বাঃ, বরুণাদি বেশ হচ্ছে।" এত লোকের সামনে এমন চেঁচাচ্ছ, সাহস কম নয়।

চেঁচানো ? লতা মিত্তির যদি পারতো তাহলে বালিসটা ছুঁড়ে ফেলত। সত্যি বরুণাদি হাঁটছে কি মজা! বরুণাদি তার বন্ধু। এই শেষ। ঠিক চরম মুহূর্ত্তেই কেমন যবনিকা নেমে আসে। মনে মনে ভাবে লতা মিত্তির।

এমন কি সেনগিন্নীরও যেন সাহস ফিরে এসেছে। বললেন— "ঈশ্বর যা করেন, ভাই, সময় না হলে কিছু হয় না। তিনি সব জানেন।" চোখ বুজিয়ে শূন্যে নমস্কার জানান সেনগিন্নী। অনেক পরে শ্রান্ত বরুণা যখন এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো তখন নার্স প্রমীলাদি স্বয়ং এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন।

বললেন—"জানো, ডাক্তার সাহেব বললেন যে কোনোদিন তোমার রিলিজ হয়ে যাবে! ষ্টেজে ফিরে গেলে আমাদের পাশ পাঠিয়ে দিও ভাই। সবাই মিলে তোমার অভিনয় দেখবো।"

সলজ্জ ভঙ্গীতে হাসে বরুণা সরকার!

অনেক পরে বরুণা আপন মনে বলে—"সারা জীবনে কি না পেলাম, মানুষ, ভালোবাসা, অর্থ, যশ, আনন্দ। একটা মেয়ের

জীবনে আর কি চাই? কিন্তু সবই যেন প্রহসন। এখন আর সে সব নিরর্থক। মনকে যেন বোঝানো পৃথিবীটা গোল, চাঁদের ভেতর অনেক পাহাড় আছে। কিন্তু এ সবের আর কোন মানে নেই। ভালো নিয়েছি দু হাত পেতে, মন্দকে নিয়েছি মাথায় পেতে।"

চুপ করে শুয়ে আছে বালিশে মাথা দিয়ে বরুণা সরকার। মুখের রঙ আর চোখের কাজলের ফাঁকে কেমন যেন প্রাণহীন পুরুষালি মনে হয় তাকে। ওদিকে গম্ভীর মর্যাদামণ্ডিত ভঙ্গীতে মহিয়সী মহিলার মত শুয়ে আছেন সেনগিন্নী। যেন হেডমিস্‌ট্রেস্। লতা মিত্তির ভাবছে—"মাগো! কি বিশ্রী। যেন দুই বোন পাশাপাশি শুয়ে আছে। অথচ বোন নয়। যেন দুই ভাই। যেন কোন্ রণক্ষেত্রে শুয়ে আছে দুই কাটা সৈনিক। রণক্লান্ত, শান্ত সৈনিকের মৃতদেহ নিঃশব্দে পড়ে আছে। কবেকার কোন্ মহাসমরের মৃত সৈনিক কে জানে?"

তুচ্ছ

ভবদেব লোকটি চতুর। চারিদিকে তার সজাগ সতর্ক দৃষ্টি। সেই খোলা চোখে চারিদিক দেখেই ভবদেব একদিন বিয়ে করল। নারী চরিত্র সম্পর্কে সে অনেক পড়াশোনা করেছে। তার ধারণা হয়েছে যে সব কথা ছাপা হয়েছে তা ছাড়াও অনেক অমুদ্রিতব্য বক্তব্য নাবীব বিরুদ্ধে আছে, উমা সেই বিশাল নারী-বাহিনীর অন্যতমা। যৌবন আর যৌন কথাটির মধ্যে একটি মাত্র অক্ষরের অভাব। যৌবনকে কবিরা রাজটীকা দিতে বলেছেন। তাঁদের আর কি, যা খুসী লিখলেই হল। সংসার ধর্ম পালনের দায়িত্ব ত' আর নেই। ভবদেব প্রভৃতি হিসেবী ব্যক্তিরা যাতে বিব্রত হয় তার জন্যই এই চক্রান্ত।

বিবাহের কিছুদিনেব মধ্যেই স্ত্রীকে কাছে ডেকে বোঝালো যে নিজেরাই যদি গৃহস্থালীর ছোটখাট কাজ সেরে নেওয়া যায় তাহ'লে কিছু পয়সা বাঁচে। তা ছাড়া সপ্তাহে রোজ মাছ না খেয়ে শুধু তিন দিন মাছ খাওয়া শাস্ত্রসঙ্গত।

উমা এই হিতোপদেশ শুনে কোথায় যেন আত্মগোপন করল, তারপর সেই নেপথ্য থেকেই অতিকষ্টে প্রশ্ন করল—বিবাহের পূর্বে ভবদেব ভালো করে ভেবেছিল কি বিয়ে করার সামর্থ্য তার কতখানি। তা ছাড়া ক্ষীণ কণ্ঠে আর একটি কথা যোগ করেছিল—রেলের কেরাণীদের মাইনে ঠিক কত সে বিষয়ে তার কোনো ধারণা নেই।

ক্ষমাসুন্দর চক্ষে ভবদেব বল্‌ল—"বিবাহ আমার কাছে অর্থনীতি, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা আমি তোমাকে ভালোবাসি।" শেষের কথাটুকু একটু ভেবে চিন্তে যোগ করেছিল।

তখনই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক পরিকল্পনা পেশ করেছিল, এখন কষ্ট করলে ভবিষ্যতের সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য করায়ত্ত। এখন প্রিমিয়ম

দিলে তবেই উপযুক্ত সময়ে পাওয়া যাবে মোটা টাকা। পৃথিবীর যে দুর্দিন বর্তমানে ঘনিয়ে এসেছে তার অশুভ স্পর্শ থেকে নিজেদের যথাসম্ভব মুক্ত রেখে এগিয়ে যেতে হবে নব জীবনের পথে।

ভবদেবের ভঙ্গী অত্যন্ত সপ্রতিভ এবং সচেতন। উমা তার এই শাণিত তরবারির মত বক্তৃতা নিঃশব্দে শুনে যায়।

বিবাহটা কিন্তু সফল হ'ল। অন্ততঃ এই জাতীয় বিবাহ যেখানে এক পক্ষ অপর পক্ষের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক সন্দেহ এবং সংশয়ে কণ্টকাকীর্ণ।

ভবদেব চতুর, সুতরাং যে কোনো বস্তুর সে মূলে চলে যায় এবং তিল যতক্ষণ না তালে পরিণত হয় ততক্ষণ সে কোনো বিষয়ে প্রকাশ্য মন্তব্য করে না। মাঝে মাঝে সিনেমায় যায়, সামাজিক কর্তব্য সম্পন্ন করতে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, জন্মদিনের নিমন্ত্রণেও সস্ত্রীক যায়। খরচের অঙ্কটা সাংঘাতিক। কিন্তু উমার পাতিব্রত্য এবং শুচিবাগীশতা সকলকে বিস্মিত করে।

ভবদেবের বন্ধু অনন্ত নাকি নিভৃতে একদিন উমার হাত ধরে টেনেছিল, সেই কথা ভবদেবকে জানিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে-ছিল উমা।

ভবদেব সান্ত্বনা দিয়েছিল "সে কি কথা! অনন্ত সেরকম লোকই নয়। রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিয়েছে। নিশ্চয়ই তুমি ভুল বুঝেছ।"

চোখের জল তখন কমে গিয়েছে, ধরা গলায় উমা বল্‌ল "নিরালায় হয়ত মিশনের তেমন প্রভাব থাকে না।"

একটু কঠোর ভঙ্গীতে উমাকে কাছে টেনে নিয়ে ভবদেব বলেছিল "আমার স্ত্রীকে আমি চিনি। অনন্ত অনন্তকাল ধরে চেষ্টা করলেও তার নাগাল পাবে না।"

এর পরের সপ্তাহেই হিসাবী ভবদেব অনন্তকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে উভয় পক্ষকেই বোধ হয় জানিয়ে দিলে যে দু' পক্ষকেই সে সমান বিশ্বাস করে।

উমারাণীর চরিত্রের চপলতা ক্রমশঃই যেন কমে আসছে। অতি ধীর গতিতে তার মধ্যে একটা সুদৃঢ় গাম্ভীর্যের ছাপ দেখতে পাওয়া গেল। ভবদেব ভাবে, উমার ছেলেমানুষী কেটে যাচ্ছে, এতদিনে তার সাবালকত্ব লাভ হ'ল।

নিজের পোশাক নিজেই তৈরী করে উমা। সিল্কের টুক্‌রা জোড়া দিয়ে চমৎকাব ব্লাউজ তৈবী ক.র। ভবদেব উৎসাহ দেয়, বলে সুবিধামত পেলে একটা সেলাইকল কিনে দেব। তাহ'লে বাড়তি জামা-কাপড় বিক্রী করে দু-চার পয়সা লাভ হতে পারে।

কিন্তু একদিন তাকে বিস্মিত করলো উমা। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে কপালে সিঁদুরের টিপটা হিসাবমাফিক বসাতে গিয়ে বলে ওঠে—"মনে করছি সুর সভাব চাকরীটা নিয়ে নিই।"

"সেটা আবার কি ?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে ভবদেব।

"নাচ-গানের স্কুল। কেন দেখনি কোনো দিন ? জগুবাবুর বাজারে উল্টোদিকে প্রকাণ্ড সাইন বোর্ড।"

"বলো কি ? আমার স্ত্রী হয়ে চাকরী করবে ?"

"তোমাব স্ত্রী বলে সৎভাবে টাকা উপার্জনে কোনো বাধা আছে কি ? আজকাল মেয়েরা ত' কোমর বেঁধে আফিসে ছুটছে। তোমার ঘর স.সাব, হাড়িকুঁড়ি সব ঠিক থাক্‌বে, আমি দুপুবে রান্না করে বাখ্‌বো।"

সুর-সভার শিক্ষিকা হয়ে উমার আর্থিক উন্নতি তেমন আশানুরূপ হল না তবে সাড়ির বৈচিত্র্য বাড়লো। ভবদেবের অবশ্য তার জন্য কোনো খরচ নেই। তবে উমা যেন কিঞ্চিৎ গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ছে। কেমন এক রহস্যমণ্ডিত ভঙ্গী। ভবদেব একটু চিন্তিত হয়েছে ইদানীং, কিন্তু তবু উমার হাত ধরে সিনেমায় যেতে তার আনন্দ হয়। বিশেষতঃ আশেপাশের লোকজন যখন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে উমা এবং তার সাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে তখন ভবদেব পুলকিত হয়।

সাংসারিক খরচের মাসকাবারি টাকা ধীরে ধীরে একেবারে

অর্দ্ধেক করে যখন ভবদেব পয়লা তারিখে উমার হাতে দিল তখন সে কিছু বল্লো না। উমা বুঝলো তার টাকাটা যাতে পুরোপুরি সংসারে পড়ে তার জন্যই সতর্ক ভবদেবের এই ব্যবস্থা।

পরদিন কিন্তু ভেলভেটের ব্লাউজটা গায়ে দিয়ে আরশির ধারে দাঁড়িয়ে উমা বলে ওঠে "এই পোশাকের সঙ্গে দু একখানা গয়না না হলে মানায় না একদম। যক্ষের ধনের মত তুমি কেবল টাকা বাঁচিয়ে রাখছো। কি হবে টাকা ?"

"তোমরা টাকার মূল্য বোঝো না, তুচ্ছ অলঙ্কার ছাড়া অর্থ সঞ্চয়ের আরো অনেক পথ আছে। নারীর অলঙ্কার হচ্ছে লজ্জা।"

সরোষে উমা বলে ওঠে "টাকা জমিয়ে আমরা করবো কি, গরীবদের অর্থাৎ আমাদের চেয়েও যাবা গরীব তাদের দান করে যাব ?"

"ক্যাস সার্টিফিকেট কেনা যাবে, গভর্ণমেণ্ট বণ্ড কেনা যেতে পারে, অনেক সুদ তাতে !"

ভবদেব মনে মনে ভাবে পূজোর সময় না হয় একজোড়া দুল কিনে দেওয়া যাবে, কিংবা তার চেয়ে বই পড়তে ভালোবাসে উমা, কোনো একটা লাইব্রেবীর মেম্বার করে দেবে, আহাব ঔষধ দুই হ'বে বই পড়া হবে, শিক্ষা হবে।

ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় কিন্তু তাক লাগিয়ে দিল উমা। কাপড়চোপড় পরে এসে ভবদেবের পায়ের ধুলো নিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালো তখন তার গলায় একগাছা সরু হার চিক্ চিক্ করছে, প্রকাণ্ড লকেটে রক্তিম পাথরখানা যেন জ্বল জ্বল করছে।

"পিসিমা পাঠিয়েছেন কাশী থেকে।" তার আঙুলে একটা পাথর বসানো আঙটি।

"আঙটিটাও তোমার পিসিমা দিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ, ভারী ভালোবাসেন কিনা। আচ্ছা তোমাদের লাইব্রেরীতে শশধর দত্তের সমস্ত বই আছে ? এখন থেকে বেশী করে পড়তে হবে।"

আঙটির দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে ভবদেব প্রশ্ন করে "তোমার পিসিমার কি আর কেউ নেই ?"

"থাকবে না কেন ? আমার পিসতুতো ভাই হিন্দু ইউনিভার্সিটির প্রফেসর।" উমার কণ্ঠস্বরে অসহিষ্ণু ভঙ্গী।

মোড়কের কাগজপত্র মুড়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল উমা। সেই দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল ভবদেব।

পৌষ সংক্রান্তির দিন উমার জন্মদিন। সেদিন আর অফিসে বসতে পাবলো না ভবদেব। সাড়ে চারটের সময় উঠে এসে জগুবাবুব বাজারেব সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

'স্থর-সভাব' প্রবেশ দ্বাবে একে একে দশ বারোটি মহিলা চলে গেলেন, ছোট মেয়েও কয়েকটি এল। পুলিশ বিভাগের ওয়াচারেব মত ভবদেব তাই লক্ষ্য কবছে। অনেক পবে মোটব থেকে মধ্যবয়সী একটি ভদ্রলোক নামলেন। অন্তত চবিত্র নষ্ট কবার মত বয়স এবং অর্থ সামর্থ্য তাঁর আছে, চতুর এবং চটুল মুখভঙ্গী! স্বয়ং রাজ্যপালও তার বাড়িতে সৌজন্য বক্ষা কবতে যেতে পাবেন এমনই লোকটির চাকচিক্য।

ভবদেব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তার অবসন্ন স্নায়ুতন্ত্রীই তাকে এগিয়ে দেয়—সে সাহস সঞ্চয় কবে তুবাব কেসে প্রশ্ন করে—"আমার নাম ভবদেব। মানে ভবদেব চৌধুরী। আপনি আমার স্ত্রীকে জানেন?

বিষাদ এবং বিস্ময়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ভদ্রলোক ভবদেবেব মুখের পানে তাকালেন, তারপব কোমল গলায় বললেন, "ভায়া শুধু আপনি কেন, আমি কাবো স্ত্রীকেই জানি না।"

সন্ধ্যার পর পার্শেল খুলে একছড়া মুক্তার মালা বার করলো উমা। চীৎকার করে বলে—"জাপানী মুক্তা। চমৎকার! বাস্তবিক পিসিমার মত মানুষ দেখা যায় না।"

গম্ভীর গলায় ভবদেব বলে—"জাপানীরা কি মুক্তা তৈরী করে নাকি?"

"না, না, তা নয়, সস্তার জিনিষ আর কি। নকল মুক্তা অথচ কেমন সুন্দর করেছে!"

ভবদেব আবার প্রশ্ন করে—"আজ কি তোমার গানের স্কুলে যেতে হবে নাকি? আর এই সব পরে?"

"না,—" এই বলে উমা তার হ্যাণ্ডব্যাগে মুক্তার মালাটা সযত্নে রাখলো। বললো—"তবে জিনিসটা কি রকম সবাইকে দেখাব বৈ কি!" ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটি খুলে কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যভরে হ্যাণ্ডব্যাগটি রাখলে উমা।

সেই রাতে ভবদেবের চোখে আর ঘুম নেই। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে যখন বুঝলো উমা ঘুমিয়েছে তখন হ্যাণ্ডব্যাগের সন্ধানে উঠলো। ঘুমন্তের মত অতি মৃদু গলায় ভবদেব বিড় বিড় করে—"জলতেষ্টা পেয়ে গেল, গেলাসটা আবার কোথায়—" এই স্বগতোক্তি যেন নিজের কানকে শোনানোই তার উদ্দেশ্য।

মনিমুক্তা সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই, কিন্তু আজ এই মুক্তা দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গে তার বুক ধক্ ধক্ করছে। নকল জিনিষ কি এত জ্বল জ্বল করে, পেনডাণ্টের পাথরটা যেন আগুন। বাথরুমের আলোটা জ্বেলে সেই মৃদু আলোয় ড্রয়ার খুলে হ্যাণ্ডব্যাগটা ভালো করে দেখলো ভবদেব। তারপর কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল।

আবার যখন বিছানায় ফিরে এল তখন উমার ঘুম ভেঙে গেছে। সেই রকম মৃদু গলায় ভবদেব বলল—"বড়ো তেষ্টা পেয়েছিল।" উভয়েই দীর্ঘক্ষণ নীরবে নিঃশব্দে পাশাপাশি জেগে শুয়ে রইল।

অফিসে গিয়েই বারাকপুরে উমার বাবার কাছে ফোন করলো

ভবদেব। গভর্ণমেণ্ট হাউসের তদারকী কাজে বৃদ্ধ সেখানেই থাকেন,—এক রকম সেই তাঁর ঘরবাড়ি।

ভবদেব প্রশ্ন করে—"কাশীতে যে পিসিমা থাকেন তাঁব ছেলের নাম কি?"

"সে কি! কাব পিসিমা? কাশীতে কেউ নেই ত' আমাদের, যদি থাকতো আমি জানতাম না, আমাব বোনই নেই একটা। না না, কি বলছো ভবদেব!"

"নাঃ, কিছু না।" চীৎকার কবে ওঠে ভবদেব, তাবপব তেমনই সজোরে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে।

সোজা চলল ভবদেব জগুবাবুব বাজারেব সেই 'সুর-সভা'য। দোতলায় উঠতেই দাবোয়ান এগিয়ে এল, "কাকে চাই?"

ভবদেব অত্যন্ত ম্লান গলায বলে—"নলিনীবাবু!"

দবোয়ান ভবদেবকে অফিস ঘবে বসিযে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঘরে এলেন নলিনীবাবু নয়, অতি গম্ভীর প্রকৃতিব এক মহিলা।

উঠে দাঁড়িয়ে ভবদেব বলল—"আমি নলিনীবাবুকে চাই।'

"নলিনীবাবু ত' কেউ নেই—আমাব নাম অর্চনা অধিকাবী। নলিনী দেবী আমাদের প্রেসিডেণ্ট। তাঁকে চাই, বসুন, ডেকে দিচ্ছি।"

কণ্ঠস্বরে অতিশয় কোমল ভঙ্গী।

নলিনী দেবী এলেন, আরো চমৎকার চেহারা। গম্ভীর এবং গভীর মুখভঙ্গী। বযস হয়েছে, কিন্তু নানাবিধ আধুনিক প্রসাধনে সেই পলাতক বয়সকে ধবে রাখা হয়েছে।

"আমাব নাম ভবদেব, আমাব স্ত্রী কি করে এখানে?"

"কে, উমারাণী? গান শেখান, নাচ শেখেন এই পর্যন্ত।"

"আপনাদেব ম্যানেজার কে? একজন পরিচালক নিশ্চয়ই আছেন।"

"আপনি ভুল করছেন, আমাদের এটি মহিলা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান, পুরুষের স্থান নেই। তবে আপনি কি আশা করেছেন জানি না। আচ্ছা—নমস্কার।"

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এই কথা কটি বলে নলিনী দেবী বিরক্ত ভঙ্গীতে ঘর থেকে চলে গেলেন।

আবার যখন পথে নামল তখন ভবদেবের সারা অঙ্গ কাঁপছে। সত্যই ত উমা কোনোদিন দেরী করে বাড়ি ফেরেনি, একদিন বাপের বাড়ি যাই বলে কোথাও বেড়াতে যায়নি। হাতছানি দিয়ে একখানি বেবি ট্যাক্‌সী ডেকে ভবদেব তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। এখনই ফ্লাটে ফিরতে হবে।

উমারাণী তখন ড্রেসিং টেবলে বসে শুক্‌নো চুলে ব্রাস চালাচ্ছিল।

ভবদেব সোজা গিয়ে তাকে টেনে ওঠালো, প্রশ্ন করল "সত্যি বল, কে তোমাকে এই সব অলঙ্কার দিয়েছে? কোথা থেকে পেয়েছ?"

"আমার পিসিমা। বলেছি ত' তোমাকে কতবার।"

হাঁফাতে হাফাতে ভবদেব বলে, "মিথ্যা কথা ছাড়ো, তোমার পিসিমা বলে কোনো বস্তু নেই। আমি সব জানি।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভবদেবের মুখের পানে তাকালো উমা, তার মনেও সন্দেহ জেগেছে।

সে ধীর গলায় বলল—"অত হৈ চৈ করার কিছু নেই, আমিই তোমাকে বলতাম। আমি নিজেই কিনেছি। তুমি টাকা কড়ি নিয়ে মাথা ঘামাও, চিন্তা করো তাই তোমাকে জানাইনি। কিন্তু শোনো লক্ষ্মীটি, এই সব নিয়ে আর অত মাথা ঘামিয়ো না, সহজ জিনিষ সহজ ভাবে নিতে শেখ।"

এত কথা শোনার মত আজ ভবদেবের অবস্থা নয়। সে বলে ওঠে, "তুমি কিনেছ?" টেবলের ওপর থেকে মুক্তার হারটা উঠিয়ে নিয়ে বলে—"এই সব মূল্যবান মণিমুক্তা তুমি কিনেছ? সত্যি করে বলো কে দিয়েছে? কেন দিয়েছে? কেন?"

উমা নীরব। হাত ধরে টেনে আনে ভবদেব, "আমার সঙ্গে এখনই তোমাকে যেতে হবে, নীচে ট্যাকসি দাঁড়িয়ে আছে।"

জুয়েলারের দোকানের উজ্জ্বল আলো এবং আর্সিমণ্ডিত কাউণ্টারে জিনিষগুলো মেলে দিয়ে ভবদেব বলে—"এ গুলোর দাম কষে দিন, আমি বিক্রী করবো। এখনই দেখতে হবে।"

জুয়েলারী দোকানের কর্ম্মচারীটির লক্ষ্য কিন্তু উমার মুখের দিকে। তারপর আর একটি আলোয় সেই সমস্ত গহণা সে ভালো করে দেখ্‌লে।

অসহিষ্ণু ভবদেব প্রশ্ন করে "আসল না ঝুটো ?"

ধীরে ধীরে ভবদেবের কাছে সরে এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটি বল্‌ল—"একেবারে নকল, থিয়েটারের গয়না, একেবারে তিন নম্বরের জিনিষ।"

লোকটি আবার উমার মুখটি ভালো করে দেখল।

দোকান থেকে বাইরে এসে হারটার দিকে রুষ্ট নয়নে তাকিয়ে ভবদেব বলে, "ঝুটো, তিন নম্বরের নকল। আসল হ'লে হয়ত হাজার হাজার টাকা দাম হ'ত, আমি বড়লোকের মত মোটর চড়ে ঘুরতাম। বাগান বাগিচা সব হত।" কেমন যেন হয়ে গেছে ভবদেব।

"আমার কত স্বপ্ন ছিল, ব্যাঙ্কে টাকা রাখবো। ওঃ, এর দাম এক পয়সাও নয়।"

তারপর উমার দিকে তাকিয়ে নাটকীয় ভাবে বলে ওঠে—"গোরুর মত ড্যাবডেবে চোখ মেলে আমার দিকে কি দেখছো অমন করে ? কি হবে আমার তোমার এই ঠুন্‌কো সতীপনায় ?

একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে উমাকে ঠেলে ফেলে দিল ভবদেব। লাইট পোষ্টটা ধরে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে রইল উমা। তারপর হাতের সেই মণিমুক্তা রাস্তায় ফেলে দিয়ে ভবদেব উন্মাদের মত ছুটে চলে গেল।

মৃদু হেসে উমা মাথার চুলগুলি ঠিক করে নেয়।

ক্ষণ বসন্ত

বিষানপুরের বাঁকের মুখে নদীটা যেখানে এসে শিশেখালে পড়েছে সেই মুখটায় একটা লক্‌গেট আছে। এই অঞ্চলের সব ষ্টীমার এই পথে চলাচল করে। ধনেখালির বড় ষ্টীমার ঘাটও কাছাকাছি, তাই বিষানপুরের বাঁকের নাম ডাক কম নয়।

ঘাটটার ওপরেই খালের গা ঘেঁষে পর পর কয়েকটি দোকানঘর, টিনের ছাত আর বাঁশ-বাঁখারীর বেড়া। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দোকান করেছে, যে যেমন খদ্দের সে তেমন বেছে নেয়। বেশীর ভাগই ভাতের হোটেল। আগে এমনটা ছিল না, মিলিটারির কৃপায় এতশত হয়েছে। পাকা রাস্তা হয়েছে, খালের গায়ে সিমেণ্ট জমিয়ে দু'চারটে বস্‌বার বেঞ্চও হয়েছে। কাছারি-কারখানার দিন হেটো খদ্দের এসে ভীড় জমায়, আর ছুটির দিন মোটর চড়ে আসে সহরের বাবু ভায়ার দল। সেদিন মেলা বসে যায়। যে যা পারে সে তাই বিক্রী করে। বেশীর ভাগ কিন্তু ডাব আর কলার বেপারী।

প্রথম দোকানটা মতিবিবির। বেশ জম্‌কালো দোকান, চালুও খুব। ভাত, রুটি, গোস্ত, পোনামাছের ঝোল সবই পাওয়া যায়। খাতা নিয়ে বসে থাকে মতিবিবি, খদ্দেরের পাতে যেমন জিনিষ পড়ে অম্‌নি গহরালি হাঁকে ভাত দ্বিতীয় দফা, বেগুনভাজা দুখানা, মাছ একখণ্ড। মতিবিবি ঠিক ঠিক দাম ফেলে। মেয়েমানুষ হলে কি হয়, এক পয়সা ঠকাবার সাধ্যি নেই কারো। লেখাপড়া জানা মেয়েছেলে, কেউ পারে ওর সঙ্গে। দেওয়ালের গায়ে কোরাণের বাণী লেখা ফরাসী তস্‌বির বাঁধানো রয়েছে, তার পাশে পাখাওলা ঘোড়ার ছবি, ঘোড়ার মুখটা মানুষের মত।

সারা অঞ্চলটায় পেঁয়াজ-রসুনের উৎকট খোস্‌বু ছড়ানো আছে।

এখানকার প্রধান আকর্ষণ মতিবিবির দোকান। বয়সটা তেমন কাঁচা নয়, কিন্তু গতরটা শক্ত, ছিমছাম গড়ন, টিকল নাক, বড় বড় একজোড়া ডাগর চোখ আর মাজা মাজা গায়ের রঙ। সুন্দরী না হলেও নেহাৎ ফেলনা নয়। লক্‌গেটের জমাদার মোকসেদ এই নিয়ে বোধ হয় হাজারবার চিন্তা করলো মতিবিবিকে সাদী করে ঘর বাঁধতে পারলে মন্দ হয় না। ওর হাতে দু'পয়সা আছে। চালাক মেয়েছেলে ডাকঘরে জমা রাখে। নগদ টাকা হাতে রাখে না।

নিজের হাতে চা বানাচ্ছিল মতিবিবি, শেষবারের মত চায়ের গরম পুটলিটা মোটা কাঁচের গ্লাসে চিম্‌টে দিয়ে নিঙড়ে দিয়ে দুধ ঢালছিল, এমন সময় আওয়াজ শুনে থম্‌কে থেমেছে। আওয়াজটা মোক্‌সেদের কানেও গেছে, সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল।

ভারী সুন্দর একখানি নৌকা এসে ঘাটে লাগছে, নৌকা না বলে বোট বলাই যায়। কাঠের সুন্দর ছই, শাদা রঙ করা, তার গায়ে কালো অক্ষরে লেখা 'ছোলতান'।

মোক্‌সেদ সখেদে বলে ওঠে, "কোথাকার সুলতান রে বাবা, চা পানি খাওয়া আর হল না মতিবিবি।"

মতিবিবি পানের পিক ফেলে বলে "যা ঘুরে আয়।"

ঘাটের গায়ে এসে যখন নৌকাটা ভিড়্‌ছে তখনও মোকসেদ এতটুকু আগ্রহ দেখায় না। ঘাটে লাগালেই পয়সা নেবে, রসিদ কেটে দেবে। বাইরে থেকে দেখা গেল লগী ঠেল্‌ছে একজন জোয়ান মিন্‌সে। পরণে রঙীন সিলকের লুঙি, গায়ে হাওয়াই সার্ট, বেশ রঙদার আদমি। কয়েকবার বেয়াড়াভাবে সামনে এগিয়ে পিছনে হটে তবে নৌকা ভিড়্‌ল। মোক্‌সেদ সেই দিকে তাকিয়ে আছে, এতটুকু আগ্রহ দেখাবে না। লোকটা নৌকা থেকে লাফিয়ে ডাঙায় পড়লো। নৌকাটা বেশ করে বাঁধলো। তারপর আবার নৌকার ভেতর ঢুকে পড়লো, পরমুহূর্তেই মাথায় একটা লাল ফেজ এঁটে বেরিয়ে এল।

[illegible] সামনে পেয়ে লোকটা প্রশ্ন করে—"ডাকঘর [illegible] [illegible] সাহেব ?"

"বিষানপুরের ডাকঘর ? এখান থেকে প্রায় তিনকোশ পথ হবে, গাঁয়ের ভেতর, হাটের গায়ে। এই রাস্তা সোজা চলে গেছে।"

নব্যাগত হতাশ হ'ল। গাঁখানা যেন শিশেখালের গায়ে হলেই ভালো হত। সেলাম জানিয়ে সে বিষানপুরের পথে চল্‌লো, আর মোক্‌সেদ নৌকাটা ভালো করে তল্লাস করতে গিয়ে দেখ্‌লে ভিতরে প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় এক বিবি শুয়ে আছে।

"ইয়ে আল্লা।" বলে সভয়ে সরে এল মোকসেদ।

"কাছিমুদ্দিব নামে কোনো মণিঅর্ডার আছে মাষ্টাব সাহেব ? তারে পাঠাবার কথা।"

মুখ না তুলেই পোষ্টমাষ্টাব বল্লেন—"না।"

"ঠিক বল্‌ছেন ?"

"এলো কি না এলো আমি জান্‌বো না তো কি তুমি জানবে ? কি বলছ মিঞা ?"

ম্লানমুখে দোবেব দিকে এগিযে গেল কাছিমুদ্দি, কি ভেবে আবাব ফিরে এসে প্রশ্ন করে—"কিংবা ছোলতানেব নামে, অনেকে আমাকে ঐ নামেও ডাকে সাহেব।"

"কেন বক্‌বক্‌ কবছ মিঞা, গেল তিনমাসেব ভেতর একটা পয়সা মনিঅর্ডার আসেনি। বুঝলে ?"

করার কিছুই নেই, আবাব তিনমাইল হেঁটে গিয়ে নৌকায় উঠ্‌তে হবে।

নৌকায় উঠ্‌তেই মধুর গলায় প্রশ্ন হল—"কি হোল, এসেছে ?"

লয়লা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে, সাড়িটা পাল্‌টে আস্‌মানি রঙের পাটের সাড়িটা পরেছে।

চমকিত [illegible] কিসের গো ?"

"বলি, গিল্‌তে হবে না ? খিদের চোটায় প্রাণটা যে চোঁ চাঁ করছে ?"

"কিন্তু গিল্‌বে কি করে ? টাকা আসেনি।"

"পোড়া কপাল আমার—এখন তাহ'লে কি হবে ?"

"আমি কি কর্‌বো !"

"কত আছে তোর কাছে ?"

"চোদ্দ আনা। তোর কত আছে—?"

অনেক খুঁজে পেতে বিস্‌কুটের টিন থেকে আট আনা বেরোল।

"তাহ'লে হল এক টাকা ছ' আনা, জয়নালকে একটা তার পাঠাই।"

"ডাকঘর কি অনেক দূর ?"

"অ নে ক দূ র, মাজা ভেঙে গেছে—"

"তাহ'লে দৌড় দে, নইলে আবার বন্ধ হয়ে যাবে।"

নৌকায় আর কিছু না থাক, চোরাই মদের অভাব নেই। এই অঞ্চল জুড়ে চোরাচালানির কারবার করে কাছিমুদ্দি। ফাউন্টেনপেন, ঘড়ি, কাপড়, মদ—সব কিছু। সেই বখরার টাকা আস্‌ছেনা। ওধারের স্যাঙাৎ দেরী করছে। ডাকঘর যাওয়ার আগে বেশ একপাত্র টেনে নিল কাছিমুদ্দি।

তারবাবুকে চারআনা ঘুষ দিয়ে তার পাঠানো হল। বিষানপুব পোষ্টমাষ্টারের ঠিকানায় জল্‌দি টাকা পাঠাও।

পোষ্টমাষ্টার বাবু বল্লেন ঃ "কাল রবিবার, টাকা এলেও দেবনা কিন্তু।"

সেইরাতে কাছিমুদ্দি আর লয়লা দুজনে মিলে আর একটা বোতল শেষ কর্‌লো। তারপর বিশ্রী কলহ সুরু হল, অনেক কুৎসিত বাক্য বিনিময় হ'ল।

রবিবার ভোর থেকেই নাম্‌লো প্রবল বর্ষা।

কাছিমুদ্দি ঘুম ভেঙে উঠে দাড়ি কামালো। লুঙিটা পালটিয়ে একটা খোপদস্ত পায়জামা পরলো, একটা ফিজি সিলকের সার্ট গায়ে চড়ালো। বেরোবার সময় রীতিমত জেনটেলম্যান।

পিছন থেকে লয়লা বলে ওঠে, "ওরা যদি টাকাই না দেয় বেরিয়ে কি লাভ?"

"টাকা যদি এসে পড়ে ঘুষ-ঘাষ দিয়ে নিয়ে নেব।"

কয়েকবার যাতায়াতে পথ বেশ পরিচিত হয়েছে। নোঙরা পল্লী আর শান্ত গ্রাম। এই জলে গরু-ছাগল আর হাস-মুরগী বাইরে দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে ভিজ্‌ছে। ডাকঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছাতেই পোষ্টমাষ্টার হেঁকে ওঠেন—"কিছু আসেনি।"

"কতক্ষণ আছেন মাষ্টার সাহেব?"

"এগারোটা পর্যন্ত।"

"আচ্ছা, আর একবার না হয় আস্‌বো।"

এগারোটার সময় যেতে মাষ্টার মশাই সেই ভাবেই মাথা নাড়লেন।

কাছিমুদ্দি বলে—"আচ্ছা, কালতক দেখা যাক্, কাল নিশ্চয়ই আসবে।"

"তোদের কালে পেয়েছে রে, কাল আর হবেনা। বলি ঘটি বাটি নেই ঘরে, বাঁধা দিগে যা।"

"হাতঘড়িটা পর্যন্ত বেচে দিয়েছি মাষ্টার সাহেব।"

মাসখানেক আগে এই কারবারের সূত্রপাত। জয়নাল বলেছিল, "দেখ, কাছিমুদ্দি, সোজা কারবার, মূলধনও তেমন চাইনা, একটু যা ভয়ে ভয়ে থাকবি। মাল পাঠাবো আমি, তুই রাতের অন্ধকারে পার হয়ে যাবি। তারপর মহাজনের ঘরে মাল তুলে দিবি। ভালো হবে, পরে যা টাকা পাবো দশআনা ছ'আনা বখ্‌রা।"

"কি রকম ভাল হবে?"

"লাভের কি আর ঠিক ঠিকানা আছে, কখনো দুশো পাঁচশো, কখনো বা হাজার।"

তার কয়েক সপ্তাহ পরে সব ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে। নৌকাটাও জয়নালের, সে বলেছে পরে একটা ষ্টীমলঞ্চ কিনে নেবে। এর ভেতরেই লয়লা এসে জুটেছে।

"কিরে জলে জলে বেড়াতে হবে! পারবি? ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াব, তারপর সময় বুঝে ভেসে উঠ্‌ব। ভয় করবে?"

একগাল হেসে লয়লা বলেছিল, "ভয় আবার কিসের? টাকার ভাগ পাব ত'?"

কাছিমুদ্দি অস্বীকাব করেনি।

জয়নাল প্রথম কিস্তির টাকা পাঠাতে খেলাপ করছে। এদিকে হাতে একটি পয়সা নেই।

লয়লা বল্‌ছিল, "চিরকাল লোক ঠকিয়ে কাটালি এখন দেখ তোর কি অবস্থা।"

"ঠকাইনি কাউকে। ঠক্‌বোনা নিশ্চয়ই। কিন্তু তুই চলেছিস কোথায়? এমন সাজ সজ্জাই বা কেন?"

"তোর মুখের পানে তাকালে ত' আর পেট ভরবে না। ক্ষিদেয় প্রাণটা জ্বলে যাচ্ছে।"

"বাইরে বৃষ্টিতে ভিজলে কি ক্ষিদেটা জল হয়ে যাবে?"

একথার কোনো জবাব দেয় না লয়লা।

পাঁচটা বেজে গেল, লয়লা আর ফেরে না। ধীরে ধীরে নৌকা থেকে বেরিয়ে মতিবিবির দোকানে ঢুক্‌লো কাছিমুদ্দি! মোকসেদ আরো দুজন মাল্লাকে সঙ্গে নিয়ে মতিবিবি বিস্তি খেলছিল।

গলার স্বরটা একটু নরম করে কাছিমুদ্দি বলে—"কি পানি রে বাবা, তাস খেলারই দিন বটে।"

"তিনজনে আর কি খেলা হয় কর্তা।" বললো মোকসেদ।

তাসে বস্‌লো কাছিমুদ্দি। তাসের খেলা দেখতে দেখতে জমে ওঠে। এক পাত্র চা আর কিছু পেঁয়াজি উড়ে গেল। কাছিমুদ্দি কয়েকটা মজার গল্প বলল। তারপর একটুকরো পাঁউরুটি চেয়ে নিয়ে হাত দিয়ে ছিঁড়ে কাঁচা পেঁয়াজের টুকরো দিয়ে রুটিটা শেষ করলো কাছিমুদ্দি।

"হুঁ।" মোকসেদ সহসা বলে ওঠে।

"ব্যাপার কি?"

"ওদিকে দেখো কর্তা, বিবির মুখটা গোমড়া হয়ে গেছে।" বল্‌ল মোক্‌সেদ।

ভালো করে বিবির মুখের দিকে তাকালো কাছিমুদ্দি। চেহারাটা খুবসুরত না হলেও মন্দ নয়। চাউনিটা নেহাৎ অকরুণ নয়।

মোকসেদের বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে। বাকী তুজন মাল্লাও উঠে গেল। কছিমুদ্দি একা।

সবাই চলে যাওয়ার পর পকেটে হাত দিয়ে বোকার মত মুখ করে কাছিমুদ্দি বলে, "ঐরে নৌকোয় মণিব্যাগটা রেখে এসে'চি। রুটির দামটা পরে দেব বিবিসাহেব। না হয় নিয়ে আসি—"

"আরে থাক, থাক, তার জন্য কি মিঞা।"

"আচ্ছা তাহ'লে কাল দেব, ক'দিন এখনো থাকতে হবে হয়ত।"

ফেরার পথে লয়লার সঙ্গে দেখা হল। তার মুখটা হাসি হাসি।

"কোথায় গিছ্‌লি রে?"

"গাঁয়ে বেড়িয়ে এলাম।"

"কি করলি সারাদিন।"

"কিছু না, হাট বাজার দেখলাম।"

"আমারও সেই অবস্থা।"

"কিন্তু মুখ থেকে পেঁজের গন্ধ ছাড়ছে, আমাকে ফাঁকি দিবি। আমিও এক পেট খেয়ে এসেছি বাজারের হোটেলটায়, বলে এসেছি কাল তুই গিয়ে হিসেব মিটিয়ে দিবি।"

"তোকে এমনি ধার দিলে ?"

"দেবেনা, তোর সঙ্গে থেকে এটুকু আর পারবো না।"

পরের দিন দু বার পোষ্টাফিস ঘুরে এসে যখন ঘাটের ধারে পৌছল কাছিমুদ্দি দেখে একটা জীপ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। লয়লার টিনের স্যুটকেস্‌টা গুছিয়ে রাখছে একজন, সেই হয়ত ড্রাইভার।

লয়লা সেজেগুজে গাড়িতে উঠতে গিয়ে কাছিমুদ্দিকে দেখে বল্‌ল, "মনে কিছু করিসনা রে, কাল এই মিঞা সাহেবের সঙ্গে হোটেলে আলাপ হল। ভারী সরিফ মানুষ। আমাকে সহরে পৌছে দেবে। যাই, এখানে থাকলে শুকিয়ে মরতে হবে।"

"যা চুলোয় যা।"

"তা তো যাবো, তোর মত লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে বেড়ানোর চেয়ে সোজা রাস্তা ধরা ঢের ভালো।"

"ঝুটা বাত।"

"মিথ্যুক, হাড় মিথ্যুক।"

বাকী কথা চলন্ত জীপের আওয়াজে শোনা যায় না।

বিকালে আবার পোষ্টাফিস।

এইবার মাষ্টার সাহেব হেসে বল্‌লেন—"একটা তার এসেছে। কাছিমুদ্দি তোমার নাম তো ?"

"কত টাকা ?

"টাকা নয়—শুধু তার।"

তার অর্থ টাকা পাঠাতে আরো সময় লাগবে। ব্যস্ত হয়োনা।

মতিবিবির দোকানে উঠে করুণ গলায় কাছিমুদ্দি বলে—"আজ আবার বোনটা চলে গেল কল্‌কাতা, ঘরের খবর খারাপ।"

"ও তোমার বোন্ নাকি ?"

"হ্যাঁ, মামাত বোন, আমার কাছেই থাকে। তা মনে করেছি ক'দিন তোমার এখানেই খাবো বিবিসাহেব।"

"আমাদের আবার খাওয়া। বেশ, যা হয় যোগাড় হয়ে যাবে।"

কাছিমুদ্দি সারাজীবনে বোধ করি এমন ভালো আর খায়নি। পাতাটা পর্যন্ত চেঁছে পুঁচে খায় কাছিমুদ্দি। মতিবিবি নিজে হাঁকে—"আর দুটি ভাত দিয়ে যাও।"

সলজ্জ ভঙ্গীতে মতিবিবি বলে—"বড় বেপোট জায়গা, নদীর ধার হলে কি হয়, মাছটা রোজ পাওয়া যায় না।"

"সিগ্রেট আছে।"

"আছে, বাজে সিগরেট, চরমাইনর। বাজারে ভালো পাওয়া যায়।"

পাওয়া যায় যেমন দামও দিতে হয়, তাই কাছিমুদ্দি চরমাইনব ধরিয়ে পরমানন্দে টান দেয়।

সারাদিন মহানন্দে দোকানে বসে কাটিয়ে দেয় কাছিমুদ্দি। মতিবিবির কাজ সমান তালে চলে। গহরালি ভাতেব থালা নিয়ে ছুটোছুটি করে—দু'একটা পাট বোঝাই নৌকা আর ষ্টীমার মাঝে মাঝে ছুটে যায়।

নিয়ম করে সকাল-বিকাল ডাকঘরে দৌড়ায় কাছিমুদ্দি।

মাষ্টার যথারীতি মাথা নাড়েন। কাছিমুদ্দির ভয় বাজারের আফগানী হোটেলের মালিক আবার টাকা না চায়। লায়লা সেখানে ধার করে খেয়েছে। শয়তানিকে নিয়ে প্রথম একদিন সেই সেখানে ঘুরে এসেছিল, লয়লার বাক্স থেকে লুকানো টাকা নিয়ে।

মতিবিবির হোটেলের রান্না চারদিন খেয়ে কিন্তু কাছিমুদ্দির গায়ে পরতে মাংস লেগেছে।

দোকানে ঢুকেই কাছিমুদ্দি বলে—"বা বেড়ে খাসির গোস্তের খোস্‌বু বেরিয়েছে ত' !"

"ভুল করলেন মিঞা। ছ্ম্বার গোস্ত পাওয়া গেছে আজ। বাঃ সুন্দর চশমাটা পরেছেন ত'?"

"এ ধূপের চশমা চোখ ঠাণ্ডা রাখে।"

"আমাকেও চশমা নিতে হবে, ছুঁচে সুতো গলাতে পারি না রাতের বেলায়।"

কাছিমুদ্দি মনে মনে ভাবে একটা কিছু কথা বলা দরকার। এদিকে অনেক টাকা বাকী পড়ে গেছে। চেয়ে বস্‌লেই হল। না চেপে যাবে।

পোষ্টমাষ্টার আজ খুশী মনে বল্লেন—"একটা চিঠি এসেছে তোমার—তুমিই কাছিমুদ্দি ত'?"

চিঠিটা পাঠিয়েছে লয়লা। কাকে দিয়ে লিখিয়েছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথার পর জানিয়েছে জয়নালের সঙ্গে শিয়ালদা ষ্টেশনে দেখা হয়েচে আর ছ চারদিনের ভেতর টাকা পাওয়া যাবে আশা হয়। মণিঅর্ডারে পঞ্চাশ টাকা পাঠাচ্ছি। যে লোকটার সঙ্গে এসেছিলাম সে মাঝে মাঝে দেখা করে। লোকটা ভালো।

সেদিন বিন্তি খেলা জম্‌লো। ছ'বোতল ধেনো আনিয়েছিল কাছিমুদ্দি। তার বদান্যতায় সবাই মুগ্ধ। রাত্রে সবাই চলে যাওয়ার পর মতিবিবি বাক্সটার তালা টেনে দেখছে ঠিক এঁটেছে কিনা।

ধরা গলায় কাছিমুদ্দি বলে—"বি বি জা ন—"

"কি মিঞা সাহেব?"

"ক'দিন ধরে কিছু বলি মনে করি, আজ মনে হয় বলেই ফেলি, মনে করছি ত' আমরা—"

কাছিমুদ্দি লোকটা অসলে অসৎ নয়, তার কাছে সহৃদয়তার দাম আছে। এই জায়গাটা মন্দ নয়, মতিবিবি মানুষটাও ভালো, হাতে ছ'পয়সা আছে। এইখানেই থাকা যাক, ঘর বাঁধা যাক মতিবিবিকে নিয়ে—

"বিবিজান হপ্তাখানেক আগেই চলে যেতাম, কিন্তু ভাবছি—"

গ্রাসটা শেষ করে কাছিমুদ্দি বলে—"ভাবছি, তোমার হুকুম পেলেই যাওয়া যায়—ভাবছি—"

এখানে থাকলে খাওয়ার ভাবনা নেই, দিনগুলো বিস্তী খেলে মতিবিবির নিরাপদ আঁচলের আড়ালে কাটানো যায়।

"মিঞা সাহেব—"

"আমি সাধারণ মানুষ—গরীর ঘরের ছেলে—"

"কি বলচেন মিঞা সাহেব !"

এমন সময় একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়ে এল,—"মিঞা সাহেব, কাছিম মিঞা—এসেছে,—"

"কি এসেছে রে ? কি ব্যাপার ?"

"আপনার টাকা, আমাকে দিয়ে মাষ্টার সাহেব খবর পাঠিয়েছে।"

মতিবিবি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

অবশেষে জয়নাল পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছে। ফিরে যেতে বলেছে আবার সেই পদ্মার চরে।

মতিবিবি শুখ্‌নো গলয়ে বলে—"কি যেন বল্‌ছিলেন মিঞা সাহেব !"

"বল্‌বো, সব কথা বল্‌বো। এখনই একবার ডাকঘরে ছুট্‌তে হবে।"

একটু ইতঃস্তত করে কাছিমুদ্দি, গলার স্বরটা আট্‌কে যায়। সত্যি সে কিছু বল্‌তে চেয়েছিল। আর একটু দেরী হলে এখানেই থাকতো হয়ত সারাজীবন। সে অকৃতজ্ঞ নয়।

তিনবেলা এমন ভালো খাওয়া কোথায় জুট্‌বে। কিন্তু সে মরদ। খেটে খেতে হবে তাকে। বিস্তি খেলে দিন কাটালে চলবে না।

দরজার চৌকাঠ পার হওয়ার সময় মনে হল ভুল করছে কাছিমুদ্দি। কিন্তু ছুটতে হয়। ডাকঘরে টাকা এসেছে, এই টাকার জন্যে দিনে তিনবার করে গাঁয়ে ছুটেছে খবর নিতে।

মনে মনে বলে কাছিমুদ্দি, 'টাকা আসবে আমি বরাবর জানি।' টাকা তৈরী ছিল আজ পোষ্টমাষ্টার একগাল হেসে টাকা দিয়েছেন। পাঁচ টাকার মিষ্টি কিনে তাঁকে দিয়েছে কাছিমুদ্দি। ফেরবার পথে আফগানি হোটেলে লয়লার দরুণ বাকী পাওনা মিটিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরেছে।

সন্ধ্যার পর মতিবিবির দোকানে হাজির হল কাছিমুদ্দি। "কত পাওনা আমার ?" গলাটা একটু কেঁপে উঠল।

কুড়ি টাকা পাওনার বদলে মতিবিবিকে পঞ্চাশ টাকা দিল কাছিমুদ্দি।

পনের মিনিটের মধ্যেই 'ছোলতান' আবার দাঁড় টেনে নদীর পথে পাড়ি দেয়।

মতিবিবির জানালায় একখানি পরিচিত মুখ দেখা যায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাছিমুদ্দি।

জয়নাল হারামজাদা এত জল্‌দি জল্‌দি যদি টাকাটা না পাঠাত।

আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল মতি-বিবির ঘরের টিমে টিমে আলো।

ক্ষণিক বসন্তের শেষ স্পর্শ বুঝি গায়ে লেগেছিল মতিবিবির। কাছিমুদ্দির দেওয়া নোটগুলি হাতে নিয়ে জানলার ধারে তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মতিবিবি।

নূতন ঠিকানা

হোটেলে ফিরে এসেই চিঠিটা পেয়েছিলাম। বেশ মনে আছে অপরিচিত হস্তাক্ষরে ঠিকানা-লেখা সেই খামখানি অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করেছি। বোম্বাই শহরে এই আমার প্রথম পত্রলাভ। পোস্ট্-মার্ক দেখে বুঝলাম কাছাকাছি অঞ্চল থেকেই এসেছে, অথচ এদিকে আমার পরিচিত লোকজন তেমন নেই।

হোটেলে থাকার অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই চিঠিখানি কোনো ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রচারপত্র বলে ভুল করার উপায় ছিল না। এই বিদেশ-বিভুঁয়ে আমার হিতৈষী কেউ আছেন, একথা ভাবতেও মনে আনন্দ। যখন দেশে ছিলাম তখন দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহর সম্পর্কে মনে একটা ভয়েব ভাব ছিল,—কার্যসূত্রে আজ সেই দেশেই এসেছি সিনেমাব চিত্রনাট্য রচনার কাজ নিয়ে।

কলকাতায় থাকতেই আমাব নতুন বই 'মন নিয়ে খেলা'র পর পর দুটো সংস্করণ হয়ে গেল, একটা সিনেমা কোম্পানী পাঁচশো টাকা এডভ্যান্স দিয়ে বই তুলবেন বলে চুক্তি করলেন, তারপর এল বোম্বাই শহরের ডাক। আগে শুনেছি কলকাতার মাটিতে সোনা ছড়ানো আছে, শুধু কুড়িয়ে নিতে জানা চাই, ইদানীং সেই সোনা-মাখানো মাটি নাকি বোম্বাই চালান হয়েছে। সিনেমা-তারকাদের স্বর্গ বোম্বাই তাই আমাব কাছে এনেছে পরম আনন্দের সংবাদ বহন করে। কলকাতার একখানি সিনেমা-সাপ্তাহিকে বন্ধুবর রামদাস ধর অর্থাৎ আর, ডি, ডি—সংবাদ হিসাবে আমার বোম্বাইযাত্রার সংবাদটুকু বেশ কায়দা করে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

"উমাশঙ্কর বরাট বিখ্যাত চিত্র-প্রতিষ্ঠান ইনটারন্যাশলাল ফিলম্ ষ্টুডিয়োর আহ্বানে বোম্বাই যাত্রা করেছেন। মেরিণ ড্রাইভে

'ব্লু বয়' হোটেলে অবস্থান কালে তিনি তাঁর নূতন উপন্যাস 'জল পড়ে পাতা নড়ে' শেষ করবেন, এই পরিকল্পনা।" এখন বোম্বাই শহরে এসে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই চিঠি।

একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলাম, এ কথা অস্বীকার করা ঠিক হবে না। যা আমার বয়স তার চাইতেও অনেক কম মনে হচ্ছিল, এই ত' ক'দিন আগেও বয়স ছিল মাত্র ছাব্বিশ।

চিঠি খুললাম;—মাধুরী ঠাকুর চিঠিখানি লিখেছেন, কখনো তাঁর নাম শুনেছি বলে মনে হয় না, ঠাকুর-বাড়ির কেউ নাকি! কিন্তু চিঠিখানি পড়ে মনে আর সে পুলক রইলো না। লেখিকা জানতে চেয়েছেন তাঁকে আমার সেক্রেটারি হিসেবে কোন কাজ দিতে পারি কি না। অতি দুঃখে মনে হাসি এল, আমার সেক্রেটারি। কিন্তু লেখিকা অতি করুণ ভাষায় আবেদন জানিয়েছেন যে-কোনও একটা কর্মের জন্য। দীর্ঘ পত্র।

আর একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের দুর্দশাব ইতিহাস। পূব-পাকিস্থানের মেয়ে, সুখ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ, এলো স্বাধীনতা, তাবপর দাঙ্গা, বাড়ির পুরুষরা কেউ নিহত হলেন আর কেউ বা নিখোঁজ। বৃদ্ধা জননী শেষ পয়সাটি পর্যন্ত খরচ করেছেন। দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের প্ররোচনায় এই বিদেশে এসে সবই গিয়েছে। শোকে-দুঃখে মার উত্থানশক্তি রহিত, যে ঘর দুখানি নিয়ে আছে, বাড়িওলা বাকী ভাড়ার দায়ে তার জিনিষপত্র যে কোনো সময় নিয়ে নেবে বলে শাসাচ্ছে। "সিনে ওয়ার্লর্ড" পত্রিকায় আমার বোম্বাই আগমন-সংবাদ শুনে মেয়েটি উৎসাহিত হয়েছে, কারণ মেয়েটি আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত, উপন্যাস ও ছোট গল্প সব তার পড়া, কয়েকটি নাকি এত কষ্টের মধ্যেও হাতছাড়া হয়নি! সুতরাং যদি কোন কাজ—ইত্যাদি।

সব কথা বিস্তারিত ভাবে মনে নেই, তবে চিঠিতে এমনই আরো অনেক কথা লেখা ছিল একথা স্মরণে আছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিদেশে বাঙালী মেয়ের দুর্দশায় ব্যথিত হলাম।

কিন্তু মেয়েটিকে দিয়ে কি কাজ করাব, সিনারিওটা অবশ্য ইংরাজীতে লিখে দিতে হবে, ওঁরা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়ে নেবেন, আমি তেমন হিন্দী জানি না। কিন্তু সেই সিনারিও কি আর টাইপিষ্ট রেখে টাইপ করানো যাবে, ক'টা পয়সাই বা পাবো? তার চেয়ে বরং গোটা কয়েক টাকা পাঠিয়ে দিই, কিন্তু মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ টাকা এই জাতীয় মেয়েকে পাঠানো কি ঠিক হবে? যদি অপমানিত বোধ করে? শেষে অত্যন্ত বিনয় সহকারে এক পত্র লিখে পঞ্চাশটি টাকা পাঠালাম, লিখে দিলাম যে আমার আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কে তিনি নিছক ভুল ধারণা করেছেন, আমি সামান্য সাহিত্যিক, এখনও অবস্থা ফিরিয়ে নিতে পারিনি।

টাকা পেয়ে মেয়েটি অবশ্য ধন্যবাদ জানিয়েছিল, কিন্তু প্রাণের পরিচয় নেই। বুঝেছিলাম নিশ্চয়ই আমাব চিঠিতে বেচারী হতাশ হয়েছে। জীবনে এই প্রথম অপরিচিতের পত্র পেয়েছিলাম, সাহায্যেব প্রার্থী হয়ে পরে অবশ্য আরো চিঠি এসেছে।

কিছু দিনের মধ্যেই হোটেল ছেড়ে দিয়ে মালাদ অঞ্চলে আরো পাঁচজন সিনেমাকর্মীর কাছাকাছি বাসা নিয়েছি। বিখ্যাত বাঙালী পরিচালক ইন্দ্রজিৎ সামন্ত আমাকে বিশেষ সাহায্য করে এই ব্যবস্থা করে দিলেন। বাড়িটা প্রাচীন ধরণের, কিন্তু ভারী চমৎকার! সন্ধ্যার পর হাতে কাজ না থাকলে দু'জনে কাছাকাছি এক কাফিখানায় বস্‌তুম, ভবিষ্যতের কর্মপন্থা আলোচনা হ'ত, আর সেই সঙ্গে দু'চার-জন বাঙালীর সঙ্গেও পরিচিত হওয়ার সুযোগ মিলিত। বাঙালীরা এই হোটেলটিতে এসে বসতে ভালোবাসেন।

সপ্তাহখানেক এইখানে অসার পর একদিন মহাত্মা গান্ধী রোড অতিক্রম করতে গিয়ে "এ্যাস্ লেন" নজরে পড়ল। সেই মেয়েটির চিঠিতেও ঠিকানা ছিল "৩১ এ্যাস্ লেন।"

মেয়েটিকে একবার দেখার বাসনা হল। এখন কিছু টাইপের

কাজ দিতে পারি। চিঠিতে সে জানিয়েছিল নির্ভুল না হলেও সে টাইপ করতে জানে। কিন্তু তিনের এক নম্বরযুক্ত বাড়িটা একটি গ্যারেজ মাত্র, সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা সিগারেট-দেশলাই ও সরবতের দোকান। ঠিকানায় আরো কি ছিল স্মরণ করার চেষ্টা করছি এমন সময় একটি মেয়ে এসে নমস্কার করে দাঁড়ালো, ঠিক পরিচিত নয়, আবার অজানাও নয়। ষ্টুডিয়োর আশে-পাশে ঘুরতে দেখি, কফি-হাউসেও আসে, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে বেশ জানাশোনা আছে। মেয়েটি এখানে আমাকে দেখে অবাক হয়েছে, কোন্ পথে মালাদ, তাই খুঁজছি কি না জানতে চাইল।

সত্যি কথা বলতে কি, এইখানে ঐ মেয়েটির সঙ্গে দেখা হওয়াটা খুব ভালো লাগলো না। মনে মনে বেশ বিরক্ত হলাম। মেয়েটার মুখটা মন্দ নয়, তবে ইন্দ্রজিতের কাছে ওর কথা শুনে আমার তেমন ভালো লাগেনি।

আমি সংক্ষেপে বললাম, "তিনের এক নম্বরের বাড়িটা ঠিক কতটুকু, তাই ভাবছি।"

মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে—"কা'কে খুঁজছেন? নাম বলুন, খুঁজে দিতে পারি।"

"না, থাক্, এমন কিছু তাড়া নেই। বাড়িতে পুরো ঠিকানাটা আছে, পরে এক সময় এসে দেখবো।"

মেয়েটি নাছোড়বান্দা, বলে—"নামটা বলে যেতে পারেন, আমি খুঁজে রাখবো।"

অতিশয় অপ্রসন্ন চিত্তে বললাম—পদবীটা ঠাকুর, তবে জোড়া-সাঁকোর নয়, পূর্ববঙ্গের।"

মেয়েটি প্রশ্ন করে—"মাধুরী ঠাকুর? তা যদি হয়, তারা ত' নেই, সে আর নেই।"

কথাটা এমন শোনালো, যেন মেয়েটি মারা গেছে। আমার

মুখেও হয় ত সেই ভাব ফুটে উঠেছিল। কারণ মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে—"আমি সে ভাবে কথাটা বলিনি। তার মানে, ওরা বোম্বাই থেকে চলে গেছে, বাংলা দেশেই ফিরে গেছে হয়ত'।"

কথাটা শুনে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, কারণ আমার ধারণা ছিল, সে ক্ষমতা ওদের ছিল না।

মেয়েটি বলল—"সব জানি না, তবে ওরা গেল সপ্তাহে চলে গেছে আমি ঠিক জানি।"

যাই হোক্, শুনে আনন্দ হ'ল, বাংলা দেশ থেকে কেউ হয়ত কিছু টাকাকড়ি পাঠিয়েছে।

মেয়েটির সঙ্গে কফিহাউসে বা ষ্টুডিয়োতে আবার দেখা হ'ল। কফিহাউসে সেদিন দেখি, স্যাণ্ডউইচ নিয়ে একা বসে আছে, সামনে কোল্ড কফির গ্লাস বসানো। ইন্দ্রজিৎ সঙ্গে ছিল, ওর টেবলেই বসতে হ'ল।

আমি প্রশ্ন করলাম, "ষ্টুডিয়োতে উনি কি কাজ করেন ছোটো-খাটো পার্টে নামেন কি?"

ইন্দ্রজিৎ বললো—"না, ও ভারী সুন্দর চুল বাঁধতে পারে, তাই ষ্টুডিয়োতে ঐ কাজেই ওর ডাক পড়ে। সব বড় বড় তারকার মাথা ওর হাতে।"

একটি শিক্ষিতা মেয়ে যে এই সামান্য কাজ করে বেড়ায় এটা আমার তেমন ভালো লাগলো না, তবে আজকাল কত কাণ্ডই না ঘটছে। ইন্দ্রজিৎ দু-একখানি ছবির নাম বলেছিল। আমি অবশ্য সে সব নাম এখানে লিখেছি না। এমন কি মেয়েটির আসল নামও বল্‌তে চাই না। শীলা বিশ্বাস এই নামটাই যথেষ্ট। অন্ততঃ এই নামের সূত্র ধরে আসল নামের কাছাকাছিও কেউ পৌঁছাতে পারবে না।

শীলা উঠে পড়েছিল, ইন্দ্রজিৎ তাকে বসতে বল্‌ল। না বসে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শীলা কথা বলে যায়—কাল আমরা 'কারলা কেভস্' দেখতে যাচ্ছি।"

ইন্দ্রজিৎ বলে ওঠে—"সারা জীবনটা ত' এদেশে কাটালে এখনও কারলা দেখোনি ?"

"দেখেছি, তবে অনেক আগে।"

শীলার কথাবার্তা এই সময় ভালোই লাগল। একটু যেন সাবল্য লক্ষ্য কবা গেল। কাবলা কেভস্ আমিও দেখিনি। এখান থেকে লোনা-ভালা প্রায় চল্লিশ মাইল, সেখান থেকে বম্বে-পুণা রোড ধরে কারলা যেতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ বলল—"উমাশঙ্কব, তুমিও যাও না এই সঙ্গে। শীলাদের পার্টি জম্‌বে ভালো।"

শীলা তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে—"সে কি, কারলা দেখেন নি ? চলুন। চলুন, আমাদের সঙ্গে। আমরা একটা ষ্টেশন-ওয়াগন ঠিক করেছি। বেশ যাওয়া যাবে।"

এমন সুযোগ সচরাচর পাওযা যায না, তাই এই প্রস্তাব সানন্দ গ্রহণ করলাম।

সাবা দিনটা হৈ-হৈ করে কেটে গেল। কারলাব ওপব দাঁড়িয়ে পশ্চিমঘাটেব আসল আকৃতি অনুমান করলাম।

শীলাব কথাবার্তা বা আচবণে এতটুকু বাচালতা ছিল না। তাই তাব দরজা পর্যন্ত পৌছে দিয়ে বিদায় নিলাম, তখনও এতটুকু ভাবালুতা প্রকাশ করিনি। পুরুষ যে ভাবে পুরুষের হাত চেপে ধবে সেই ভাবেই তার হস্তস্পর্শ করেছি। শীলার অন্তবঙ্গতায় আমি মুগ্ধ। আমাদের এই ঘনিষ্ঠতাব পিছনে হয়ত কিঞ্চিৎ যৌন-আকর্ষণ ছিল, তখন কিন্তু তা বুঝিনি এতটুকু। শীলাকে ভালোই লাগছিল, বয়স কত জানতে চাইনি। অনুমানে বুঝেছিলাম অন্তত চল্লিশ-পঁচিশ হবে। অবশ্য ঠিক বয়স আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরও জানতে পারিনি।

ইতিমধ্যে আমার খ্যাতি চার দিকে ছড়িয়ে পড়ায় স্থানীয় বাঙালী ক্লাবে বঙ্গ-সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেছি। দু'-এক জন সম্ভ্রান্ত মহিলা সোজাসুজি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁদের বাড়ি। আমি কিন্তু শীলা বিশ্বাসের সঙ্গেই সব চেয়ে বেশী সময় কাটাচ্ছি।

প্রতিদিন তার সঙ্গে দেখা হয়। প্রথম প্রথম কফিহাউসেই দেখা হত। তার পর কিন্তু পূর্বাহ্ণে ব্যবস্থা করে নানা জায়গায় ঘুরতাম। সেই আমাকে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে নিয়ে গেছে। এমন কি, কি ভাবে মণিঅর্ডার ফরম ভর্তি করতে হয় তাও শিখিয়েছে।

এটা যদি শীলা বিশ্বাসের কাহিনী হ'ত তাহলে কি ভাবে আমরা ক্রমশঃ অন্তরঙ্গ হলাম, তার একটা বিস্তারিত বিবরণ দিতাম; কেন তাকে অত ভালো লেগেছিল সে কথাও বল্‌তাম।

কিন্তু আমার এই গল্পে যা ঘটেছিল সেই কথাই লিপিবদ্ধ করেছি' তাই আমি শীলা বিশ্বাসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠলাম শুধু এই কথা বলাই যথেষ্ট। এই কথা বলছি বটে, তবে ভাবছি চেষ্টা করলেই কি আর পারতাম! সেই প্রথম দিনের মত আনন্দময়ী মূর্তি নিয়ে শীলা যে সব সময় আস্‌তো তা নয়, অনেক সময় অনেক দুঃখ, অনেক তিক্ততার কথাও শোনাতো। কোনো সময় ভাবিনি যে, আমার ওপর শীলার আসক্তি ক্রমেই বাড়ছে। এখন মনে হয় যদি কোনো দিন কোন দুর্বল মুহূর্তে আবেগভরে একটা চুমা খেয়ে বস্‌তাম তাহলে হয়ত সে তাই নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতো। তার মনে যে আমার প্রতি প্রকৃত বন্ধুত্ব জেগেছিল, একথাও বিশ্বাস করতে আমার সন্দেহ হয়। মোট কথা শীলার হয়ত আমাকে ভালোই লাগ্‌তো, আমাকে বোধ হয় বিশ্বাসও করতো, জান্‌তো আমি তাকে ঠকাবো না।

আমি অকপটে সব কথা বল্‌তাম। বাড়িভাড়া কত দিই, কোন্ মাসে কি রকম পাচ্ছি। কলকাতার প্রকাশকরা ঠিক মত টাকা-কড়ি পাঠাচ্ছে কি না ইত্যাদি।

এক দিন শীলা বলল—"প্রতিদিন যদি রাতের খাওয়াটা তোমার ঘাড় ভেঙে খাই, তাহ'লে তোমার চল্‌বে ?'

ইদানীং আমরা প্রতি রাত্রে একত্রে খেতাম, কারণ আমি জান্‌তাম, আজকাল ওর তেমন রোজগার নেই। যে দু'টি ষ্টুডিয়োতে শীলা কাজ করতো, সে দুটিতে বর্তমানে কোনো কাজ নেই, দু'টি ষ্টুডিয়োই বন্ধ।

আমি কথা চাপা দিয়ে বলি—"তোমাকে সঙ্গে রাখার ফলে খরচ বরং কম হয়। আমি তোমার মত মারাঠী বা গুজরাটি ভাষা জানি না। কি খেলে সস্তা হয়, সে তোমারই জানা আছে বেশী। আরো দু'চার বছর আগে বোম্বাই এলে বেশ হ'ত।"

"হ্যাঁ, আগে অরো অনেক ভালো ছিল। আমার কাছে একটা বই আছে, যুদ্ধের আগেকার বোম্বে সম্পর্কে ভারি সুন্দর কথা আছে। একজন আমেরিকান সাহেবের লেখা। ভারি চমৎকার বই।"

আমি বল্‌লাম বইটি আমার চাই। শীলার বাসার দিকেই যাচ্ছিলাম, সে সাগ্রহে বল্‌ল—"বেশ। এখনই যদি আসো তাহ'লে খুঁজে দেখতে পারি। নিশ্চয়ই কোথাও আছে।"

খাটের পাশে বেতের র‍্যাকের নীচের তলায় বইটা খুঁজে পাওয়া গেল। পাতা উলটিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ আমারই হাতের লেখা নজরে পড়ায় চমকে গেলাম। মাধুরী ঠাকুরকে যে জবাব দিয়েছিলাম সেই চিঠি!

আমি সবিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলাম,—"এ চিঠি তুমি পেলে কি করে ?" এই সময় লক্ষ্য করলাম, খামের ওপর পেনসিলে লেখা আছে 'অত্যাচারী বাড়িওলা।' 'পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বনেদী পরিবার,' 'বৃদ্ধা মা' 'মাধুরী ঠাকুর'।

পুনরায় প্রশ্ন করি—"এ চিঠি তুমি কি করে পেলে? পেনসিলে এ সব কার হাতের লেখা ?

আমার মুখের দিকে বোকার মত নীরবে চেয়ে রইল শীলা, যদি তাড়াতাড়ি একটা মিছে কথা বলে দিত, তাহলে হয়ত আমিও তা বিশ্বাস করে নিতাম। আমার সন্দেহ এমনই ক্ষীণ যে উদ্ভট উক্তিও দ্রুত তালে বলে গেলে আমি তা গ্রহণ করতাম। কিন্তু শীলা আমার মুখের দিকে নির্বোধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিছুই বলে না।

"তুমিই করেছ"?

অতি ধীরে মাথা নাড়ল শীলা।

"কেন"?

"যদি আবার চিঠি দিতে হয়, তাই আগের চিঠিতে কি লিখেছি তার সংক্ষিপ্ত নোট রেখে দিয়েছিলাম।"

কথা বলার ভঙ্গীটা কিঞ্চিৎ বেদনাভরা, কিন্তু প্রাথমিক ধাক্কা সে কাটিয়ে উঠেছে, কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা নেই।

"তুমিই তাহ'লে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখেছিলে, কিন্তু অন্য নামে কেন"?

"মাধুরী ঠাকুর নামটা ভালো, তার পর পূর্ব-পাকিস্তানের মেয়ে, তোমার বাড়িও ত পাকিস্তান। হয়ত করুণা হবে তাই।"

গলার স্বর যথাসম্ভব শান্ত করে বলি—"তাহ'লে মাধুরী ঠাকুর বলে কেউ নেই।" পাথরের মূর্তির মত মুখ করে রইল শীলা। তার পর বলল—"অন্ততঃ আমার জানা নেই, ও নাম আমারই বানানো।"

"পাকিস্তান, বৃদ্ধা মা, পুরাতন বনেদীঘর, অত্যাচারী বাড়িওলা সব মিথ্যা। তুমি একটা পাকা জুয়াচোর।"

"বরং বলা উচিত এ আর এক উপন্যাস।" এইবার শীলা হাস্‌ল।

"আর তুমি বলেছিলে ওরা দেশে ফিরেছে, এই মিথ্যাটুকু বলার কি প্রয়োজন ছিল?"

"নেহাৎ অপ্রয়োজনীয় নয়,—যাদের চিঠি লিখি তারা আমার পিছনে ঘুরে বেড়াক, এ আমি চাই না। ঐ দোকানের ঠিকানায়

চিঠি আসে, সপ্তাহে এক আধবার দেখা করে নিয়ে আসি। তোমাকে ওভাবে সেদিন ঘোরা-ফেরা করতে দেখে ভয় হয়েছিল, আগে কখনও এমন আর হয়নি।"

"তাহ'লে আরো অনেককে এই ভাবে চিঠি লেখা চলে তোমার? মিথ্যা নাম, মিথ্যা ঠিকানা! কি চাও তুমি? চাকরী? তাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, সেটা ভদ্র ভাবে আবেদন করলেই পারো?"

"চাকরী আমি চাই না,—আমার দরকার টাকার। আমি যদি টাকা না চেয়ে চাকরী চাই, তাহলে টাকাই পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আমি কিন্তু কাজ চেয়ে চিঠি দিই"

দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করে শীলাই আবার বলে—"কিন্তু এর জন্য তোমার এত চিন্তা কিসের?"

"ধরো কেউ যদি তোমাকে কাজ দেয়, তুমি কি করবে?"

"যাবো না, আর কি করবো! তবে কেউ যে ডাকবে না, তাও জানি।"

"আমিই ত' একটা কাজ দিতাম।"

"তুমি সেনটিমেনটাল। তার চেয়ে পঞ্চাশ কি একশো টাকা সাহায্য করাটাই অনেকের কাছে সহজ। তা' ছাড়া সব চিঠিতেই আমি জানাই আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, সামান্য টাইপ জানি। একথা জেনো তোমার সম্বন্ধে বেশী খবর জানা থাকলে তোমাকে ও চিঠি আমি কখনও লিখতাম না। কাগজে তোমার খবরটা পড়ে ভেবেছিলাম তুমি শাঁসালো ব্যক্তি। একটু পদস্থ লোক বা পয়সা-ওয়ালা লোক, নইলে আমি চিঠি লিখি না। পুরুষদের কাছে চমৎকার মেয়েলী নাম পাঠাই, আর মেয়েদের কাছে উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবক, জালিয়াতির চাইতে এটাকে আমি বরং খেলা মনে করি, আমার ভালো লাগে। দু'চার পয়সা পাই বটে, কিন্তু এর জন্য অনেক ভাবতে হয়, অনেক সময় লাগে। ক্রসওয়ার্ড পাজলের চেয়ে ঢের-বেশী ইনটারেষ্টিং। সেদিন এক ধনী মহিলাকে লিখেছি—'বাড়িতে

ক্ষয় রোগাক্রান্ত ছোট বোন, বৃদ্ধা মা—' নিশ্চয়ই বেশ কিছু আসবে কিন্তু তার বদলে এল একটা হাসপাতালের ঠিকানা আর পরিচয়-পত্র।" এই বলে শীলা হাস্‌তে থাকে।

"হেসো না, বিষয়টা মোটেই হাসির নয়।"

"কিন্তু, এর জন্য তোমার মাথা খারাপ হচ্ছে কেন? তুমি ত' আমাকে বেশী দিন জানো না।"

"তা বটে, তবে তোমাকে আমার ভালো লেগেছিল।" আমি অতি কষ্টে বলি।

"বোকামি কোরো না। এতে কার কি ক্ষতি! সাধ্যের অতিরিক্ত কেউ নিশ্চয়ই দেয় না। অথচ আমার প্রয়োজন। শুধু চুল বেঁধে আর ক' টাকা রোজগার হবে?"

"কিন্তু তুমি যে বললে, চাকরী পেলেও তা নেবে না?"

"না, তা নেবো না, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, চুল বেঁধেই আমার দিন চলবে।"

"কিন্তু এই ভাবে বুদ্ধির অপব্যয় করা অন্যায়, মানুষের সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে তুমি ঠকাচ্ছো! এটা শুধু নীচতা নয়, অতি নোংরা কাজ।"

"কে কা'কে ঠকায়? বড় বড় ব্যবসাদার জাল ওষুধে আসল লেবেল দিয়ে ঠকায় না? ব্যাঙ্কওলারা রাতারাতি গণেশ উল্টিয়ে ঠকায় না? ম্যানেজিং এজেন্ট শেয়ার-হোল্ডারদের ঠকায় না? তুমি লেখক হিসাবে পাঠকদের ঠকাও না, প্রকাশকদের সাহায্য করো না সরল পাঠক ঠকানোর ব্যবসায়?"

"যে-কোনো ভাবেই লোক ঠকানো অন্যায়।"

"তোমার পাঠশালায় আমি পড়ি নি। বাড়ি গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভাবো।"

ওর উপদেশ আমি অবশ্য গ্রহণ করিনি। সেই রাত্রে সব চেয়ে ভালো উপদেশ পেয়েছিলাম, আমারই মন থেকে। বুঝলাম, আজীবন

এই ভাবে পেশাদার ভিক্ষাবৃত্তিই তার বিলাস, 'আমার ভালো লাগে, বেশ ইণ্টারেষ্টিং।' কোন দিন ধরা পড়ে হয়ত জেল হ'বে, তারপর আবার খেলা সুরু করবে। মনকে দৃঢ় করলাম, ওর ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল হলাম। জীবনে আর কোন দিন দেখা করবো না স্থির করলাম। কিন্তু তার ভেতর আবার ভাবলাম, হয়ত' ঈশ্বরের এও এক খেলা, পাপপঙ্ক থেকে কি ভাবে ওকে টেনে তোলা যায় তা-ও ভাবি।

এ কথাও ভেবেছি, তার সব কথা যেন আমি কাউকে না জানাই এ অনুরোধ সে ইচ্ছা করেই করেনি। আমি যে তাকে ফাঁসাবো না, তা সে ভাবেনি। আমার ওপর তাব অখণ্ড বিশ্বাস এই ভেবে আনন্দ পেলাম। আজ ভাবি, তখন আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম, তাই তাব স্বপক্ষে সম্ভাব্য যুক্তি খুঁজছিলাম। এখনও হয়ত তেমনই ভালোবাসি কে জানে?

প্রায় সপ্তাহখানেক তাকে এড়িয়ে চলি। ইন্দ্রজিৎ একদিন জানতে চাইলো কেন আর কফি হাউসে আসছি না। বললাম, আজ-কাল বড় ব্যস্ত আছি। তাড়াতাড়ি স্ক্রিপট শেষ করছি। বুঝলাম ঠিক বিশ্বাস করেনি ইন্দ্রজিৎ এবং আর প্রশ্নও করেনি।

অবশেষে শীলাকে একটা চিঠি দিলাম। কফিহাউসে এল শীলা, বললাম চলো পার্কে বসে কথা বলা যাক্। রাজী হ'ল না, কফি-হাউসে বসেই প্রশ্ন করলাম, তোমার প্রতি মাসে কত খরচ লাগে? চুল বাঁধাব কাজ ছাড়া বাকী টাকা আমি দেব, বিনিময়ে আমার স্ক্রিপট্ টাইপ কবতে হবে, তবে ঐ জাতীয় চিঠি আব লেখা চলবে না। আমার এই বাতুলের প্রস্তাব যথোচিত আবেগ ও আন্তরিকতা মিশিয়ে কবেছিলাম সে কথাও মনে আছে।

আমার খরচ অবশ্য অনেক হবে, তবে নতুন বইটার মাল-মশলা কিছু শীলার কাছে পাবো, তাই প্রকাশকের কাছে পাওয়া এ্যাড-ভ্যানস থেকে এর মাইনে দেব, এই মতলব করেছিলাম।

আমার প্রস্তাবটা শুনে শীলা এতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি, তবে তার মুখ দেখে মনে হল সে আমার মনোভাব বুঝেছে। সে শুধু বললো—"কিন্তু, এত টাকা তুমি পাবে কোথায়? এ ভাবে খরচ করলে পূজোর মধ্যেই তোমার হাত খালি হবে, স্ক্রীপটের টাকা ত' খরচ হয়ে গেছে।"

"আমার নতুন উপন্যাস শেষ হলেই বেশ কিছু টাকা পাব আশা করি। তাড়াতাড়ি শেষ হবে এই আমার ধারণা।"

শীলা বলল—"তাহ'লে আমার চাকরীটা বেশী দিন চলবে না?"

"এর পর কি যে হবে কে জানে? যত দিন পারি তোমাকে ছাড়বো না। তুমি দয়া করে রাজী হও। তবে কথা দাও যত দিন কাজ করবে সোজা পথেই চলবে। তুমি হয়ত আমাকে বোকা ভাবছো, কিন্তু তোমার সেদিনকার কথা শুনে অবধি আমার মন ভেঙে পড়েছে, আমাকে শান্তি দাও।

"তুমি হাঁদারাম, ছোট ছেলেও তোমার মত করে না। আচ্ছা, তোমার কথাই থাক, চাকরী আমি নিলাম।"

মন থেকে একটা ভার নেমে গেল, যদিও জানি শীলার কাছে আবেগ বা হৃদয় বলে কোনো কিছুই নেই, তবু আজ যে ও রাজী হয়ে গেল এতেই আমার বুকটা বিজয়ের আনন্দে ভরে গেল।

গর্ব করে বলেছিলাম স্ক্রিপট আর নভেল একই সঙ্গে শেষ করবো তা অবশ্য হল না, উপন্যাস অতি ধীর গতিতে অগ্রসর হতে থাকে, স্ক্রীপটের তাড়া বেশী, কাজও এগোয় না।

এর পরবর্তী মাসের কথা ঠিক যতটুকু বলা প্রয়োজন, তার বেশী বললো না। অনেকের ধারণা, লেখকদের হাতে যখন আর কোন কাজ থাকে না, তখন আধ ঘণ্টায় তারা উপন্যাস লিখে ফেলে। তাদের কাছে আমার কাজের গুরুত্ব বোঝানো উচিত হবে না।

শীলা প্রতিদিন ঠিক ঠিক সময়েই আস্তো, আমার স্ক্রীপট যেমনটি দিতাম পাশের ঘরে বসে নির্ভুল টাইপ করে দিত। পুরানো

মেসিন, তাই 'ডি' আর 'আর' কথা ছুটো ভাঙা থাকায় একটু খারাপ দেখাতো। কোনো কোনো দিন আধ ঘণ্টার ভেতর কাজ সেরে বসে গল্প করতো।

একদিন আমাকে বল্‌ল—"তোমার সব চেয়ে বড়ো ত্রুটি, যে-সমাজের ছবি তুমি আঁকছো, তার কিছু জানো না। হাই সোসাইটির কি জানো তুমি ?"

শুনে যাই ওর কথা, যে টাকা প্রতি মাসে ওকে দিতে হয়, সেটা তেমন বেশী না হলেও আমার পক্ষে অনেক। প্রতি মাসে ওকে টাকা দিয়ে ব্যাঙ্কের পাশ-বইটা দেখি আর ভবিষ্যৎ ভেবে চমকে উঠি।

ছু'মাস কাট্‌বার পর ভাবলাম, আরো বেশী সময় কাজ করা উচিত, এবং রাতের খাওয়াটা বন্ধ করলে কিছু খরচ বাঁচবে।

দিনে প্রায় চোদ্দ ঘণ্টা কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।

আগে বলেছি, বেঙ্গলী ক্লাবে বক্তৃতা দেওয়ার পর এখানকার বিশিষ্ট বাঙালী মিঃ চৌধুরীর স্ত্রী তারা চৌধুরীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। মাঝে মাঝে তাঁরা নিমন্ত্রণ করে পাঠাতেন। এক কাপ চা বা এক খণ্ড কেকের জন্য অত দূরে গাড়ি ভাড়া করে যাওয়া পোষাতো না, তাই যাইনি। তাই তাঁর চিঠি আস্‌তে আনন্দের চাইতে রাগটাই বেশী হ'ল, আবার নিমন্ত্রণ।

আমার ভুল হয়েছিল, তিনি জানতে চেয়েছিলেন—সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন একটি বাঙালী ছেলেকে সিনেমা লাইনে কোনো কাজ দিতে পারি কি না ? আমদের এখানে তেমন কিছু খালি নেই, অথচ ছেলেটি বড়ই কষ্টে পড়েছে, তার চিঠিটা এই সঙ্গে পাঠালাম।

সংলগ্ন চিঠির ঠিকানা 'তিনের এক এ্যাস্‌ লেন।' আমার টাইপ-রাইটারের ভাঙা 'ডি' এবং 'আর' বার বার ভাঙা দাঁতের মত চিঠি-খানিতে ফুটে উঠেছে। চিঠিটা আমার মেশিনেই ছাপা।

ছি-ছি! শীলাটা কি! আমাকে নির্বোধ ভেবে এখনও এই কাজ করে চলেছে ? বেশ এই শেষ।

ও ঘরে আস্‌তেই বললাম—"ওয়ার্থলেশ !

আমার এই জাতীয় অভিবাদনের ভঙ্গীতে সে সচকিত হ'ল, তার পর রাগের মাথায় সেদিন তাকে কি যে বলেছি আর কি বলিনি তা আমার মনে নেই। শীলা অস্বীকার করেনি চিঠিটা তার।

বল্‌লাম আমি তার মাইনে যোগাবার জন্য আজ পনের দিন একবেলা খাচ্ছি, ও যে একটা পিশাচ, মিথ্যাচারিণী নারী সে কথাও বলেছি। আরো কত কি বলেছি কে জানে!

শীলা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, মুখ ক্রমশই ম্লান থেকে ম্লানতর হয়ে গেল! শুধু একবার বলেছিল "তেমন অন্যায় কিছু করিনি।"

আমি তাকে যখন বল্‌লাম—"তুমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।"

শীলা তেমনই ঠাণ্ডা গলায় বল্‌ল—"বেশ!"

পরের সপ্তাহে বাসা বদ্‌লেছিলাম' আর সেই মাসেই সব কাজ শেষ করে বম্বে ছেড়ে চলে এসেছি ।

শীলার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল, বার বছর পর এক হাই-সোসাইটির ড্রয়িং-রুমে। শীলা বল্‌ত আমি হাই-সোসাইটির কিছু জানি না, তাই কল্‌কাতাতায় এসে সে সুযোগ পেয়ে তার সুযোগ নিচ্ছি। আমার ভক্ত-সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে দু'এক জায়গায় চায়ের নিমন্ত্রণে ডাক পড়ে, সেখানে চিড়িয়াখানার প্রাণীর মত গিয়ে বসি, সবাই আমাকে দেখে, কিছু শুনি, কিছু দেখি।

নিউ আলিপুরে এক হাল ফ্যাসানের বাড়িতে চায়ের আসরে ডাক পড়েছিল। ড্রয়িংরুমে ঢুক্‌তেই সে মেয়েটি আমার দিকে একটু তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে বাইরের বিরাট ডি সটো মোটরে উঠলেন, নিঃসন্দেহে সে শীলা। শুনলাম শীলা এ বাড়ির রাঙা-বৌদি। মিঃ হাজরা মাস দুই আগে বম্বে থেকে বিয়ে করে ফিরেছেন।

অনেক দিন আগের কথা একে একে মনে পড়ল,—আজ শীলার

নতুন ঠিকানা হয়েছে, কিন্তু কে জানে, গোপনে কোনো পানওয়ালার দোকানে গিয়ে তার কোনো চিঠি এসেছে কি না সে খবর কি এই বাড়ির নতুন বধূটি নিয়মিত নেয়? এখানেও নিশ্চয়ই টাইপরাইটার আছে, হয়ত অবশেষে একদিন আবার ধরা পড়ে যাবে।

সেদিন কি হবে? সেই কথাই ভাবছি।

জলপানি

ভোরবেলা হাঁকডাক করে হৈমবতীকে তুলতে হয়। গতরাত্রে অনেকক্ষণ ধরে পড়েছে, ফলে আরো অনেকক্ষণ চোখে ঘুম আসে নি, তাই তার চোখের পাতায় এখনো ঘুম লেগে আছে। হৈমর বাবা গোয়াল ঘর থেকে সাইকেলটা বার করে পাম্প করছে, এখনই হাইড রোডের কারখানায় দৌড়াতে হবে। অতি মৃদু গলায় হৈমর বাবা বলছে কি বিশ্রী দিনটা, মেয়েটা কি করে যে যাবে। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণই নেই।

সারারাত ধরে বৃষ্টি পড়েছে, এখন আবার পশ্চিমদিক থেকে জোরে হাওয়া বইছে, হয়ত ঝড় উঠবে। রাস্তার ওপরে চৌধুরী বাবুদের বাড়ির গম্বুজের ঘড়িটা দিনরাত দেখা যায় কিন্তু এমনই প্রবল বৃষ্টি যে সব ঝাপসা হয়ে আছে, কাছের মানুষই অস্পষ্ট।

হৈমর মা রাগারাগি করছে, সেই এতক্ষণ ধরে ডেকে হৈমকে তুলেছে, এদিকে রান্না ঘরের খোলার চাল ভেদ করে এমনই জল নেমেছে যে কুড়িয়ে আনা কাঠকুটো দিয়ে যে উনান ধরাণো হয়েছিল তা নিভে গেল। হৈমর মার মেজাজও পঞ্চমে চড়েছে।

হৈম তাড়াতাড়ি উনানের ধারে রাখা এনামেলের বাটি চাপা বাসি রুটিখানা টেনে নেয়। এইবার সে পরীক্ষা দিতে যাবে। তার ছোট ছোট তিনটী ভাই বোন এক সঙ্গে জড়োসড়ো হয়ে দিদির দিকে তাকিয়ে আছে, ভয় এবং ভক্তিতে। হৈম মাথা নীচু করে নীরবে খেয়ে চলেছে। তার ভয় দেরী হয়ে যাবে, সামনের চৌধুরী বাড়ীর ঘড়িতে সাড়ে ছটা বাজায় আওয়াজ শোনা গেল। গতরাত্রে শাদা ফ্রকটা মা সাবান দিয়ে কেচে রেখেছেন। ঐটি একমাত্র ভালো জামা, শাদার ওপর নীল ফুল তোলা। হাতাটা বেশ কোঁচকানো।

আজ বড় ভয়ঙ্কর দিন, আজ হৈম-র জীবনের অগ্নি পরীক্ষা, জলপাণির পরীক্ষার শেষদিন। কোমরে কাপড়ের বেল্টটা টেনে দিতে তাই হাত কাঁপছে হৈম-র।

হৈম-র মা দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকলেন। বাইরের প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা নির্বাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছেন। এদিকে বৃষ্টির ছাঁটে সাড়িটার পায়ের দিকটা একেবারে ভিজে গেছে। বাড়ীর বিড়ালটা তার সদ্য-জাত তিনটী বাচ্চা নিয়ে নিরাপদ শুকনো জায়গায় ছুটে পালালো।

কী বৃষ্টি! কী বড়ো বড়ো ফোঁটা! ওদিকে আকাশের ডাকও কম নয়। বাড়ীর সামনের রাস্তাটা নদী হয়ে গেছে। কল-কারখানা-অফিসের অসামীরা কাপড় কোমর অবধি তুলে জুতা হাতে করে বিরস বদনে চলেছে। রাস্তার পাশের কাঁচা ড্রেণ থেকে প্রবল বেগে জলটা নীচের জমিটায় পড়েছে, যেন নায়েগ্রা প্রপাতের ক্ষুদ্র সংস্করণ। ঝড়ের দপটে নারিকেল দেবদারু গাছগুলি বেগে আন্দোলিত। হৈম রকম সকম দেখে বুঝেছে, এই বৃষ্টি সহজে থামছে না। হয়ত দু'চার দিনও চলতে পারে।

হৈম-র মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। রান্নাঘরের জানলার কেরোসিনের টিন কাটা পাল্লাটা খুলে পড়ল। কুলুঙ্গীতে অনেক দিনের একটা পুরাণো কাগজে জড়ানো কি যেন রাখা ছিল। হৈম-র মা কাগজটী টেনে বার করলেন। সযত্নে সেটি খুললেন। তার ভিতর প্লাসটিকের বাঁটওয়ালা একটা ছাতা ছিল। হৈম-র বাবাকে ঐ ছাতাটা ডিব্রুগড়ের চা-বাগানের সহকর্মীরা উপহার দিয়েছিল। সে অনেক দিনের কথা। হৈমর-মা যত্ন করে ছাতাটি রেখে দিয়েছেন দুর্দিনের জন্য।

ছাতাটি খুলে হৈমর হাতে দিয়ে মা বললেন, 'এই ছাতা নিয়ে যা, কিন্তু খুব সাবধান, ঝড়ের মুখ সাবধানে ধরিস নইলে উলটে যাবে, ছাতাটা হারাস নি যেন।

হৈম বেরিয়ে পড়ল। এখান থেকে এক মাইলের ওপর হাঁটলে তবে স্কুলে পৌঁছানো যাবে। সজোরে ছাতাটা ধরেছে হৈম, যেন একটা প্রকাণ্ড তাঁবু, অপর হাতে আছে খাতা আর কালির শিশি।

জলবৃষ্টি তার ভালোই লাগে। যেন সমুদ্রের জল তার মুখে এসে পড়েছে। সমুদ্র কখনও দেখেনি, কিন্তু সমুদ্রের স্বাদ যেন এই বৃষ্টির জলে মাখানো। ঝড়, জল, বৃষ্টি তাই হৈমর আনন্দের বস্তু। হৈমর বাবা, মা কেউ কিন্তু এই খবর জানেন না। সবাই জানে ক্ষীণজীবি হৈম, কিন্তু কঠিন কাজে তার মত উদ্যোগী আর কে! মার অসুখ করলে ঐটুকু মেয়ে সবাইকে রেঁধে বেড়ে খাওয়ায়, বাড়ীতে থাকলে থালা বাসন মাজে—সপ্তাহে একদিন নিয়ম করে সাবান কাচে। সে-ই বাড়ীর বড়ো মেয়ে। ভঙ্গীটা নরম এবং শান্ত, তবু হৈম-র চরিত্রে দৃঢ়তা আছে। তাই সে পড়াশোনায় এতো ভালো, এত কষ্টেও স্কুলের পুরস্কার তার বাঁধা। আজ ক' বছর ফ্রি সিপ্ চালু আছে বলেই পড়া হচ্ছে। নইলে হৈমর বাবার এমন তালুক নেই যে তিনি মেয়ের পড়ার খরচ জোগাবেন। হৈমর মা মাঝে মাঝে বলেন—এই বেলা একটা বর টর খোঁজো। ধুমসো মেয়ে ঘরে বসে থাকবে, সে আমার চলবে না। যা দিনকাল পড়েছে—

বড় রাস্তায় পৌঁছতেই একটা প্রকাণ্ড গাড়ী হৈমর সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর স্কুলের বন্ধু অলকা নন্দীর গাড়ী। গাড়ীর মধ্যে অলকার মাও আছেন। তারা হৈমকে তুলে নেয়। হৈমর কিন্তু বড়োলোকের এই করুণা ভালো লাগে না। এতে স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়, আড়ষ্টতা বাড়ে। সর্বদাই আপনাকে কেমন অপরাধী হনে হয়। যে বস্তুতে অধিকার নেই, অপরের করুণায় তাইতে প্রবেশাধিকার লাভ, এ বড় অস্বস্তি! ওদের সঙ্গে নানারকম কথা বলতে হয়। পোষাকি ভদ্র কথা, প্রতিটি কথার ওজন জানা চাই।

পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছানোর আগে হৈমর আত্মবিশ্বাস যেন ফিরে আসে না। হলঘরটা বড় চমৎকার, বিরাট বড় বড় জানলা, তাতে

কাঁচের সার্সি বসানো। প্রথমেই ডিকটেশন, তারপর অঙ্ক, কী কঠিন প্রশ্ন। যিনি পাহারা দিচ্ছেন তাঁর কিন্তু প্রাণে মায়া আছে, প্রশ্ন কঠিন বুঝে তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে একটু ইঙ্গিত দিয়ে সকলকে শান্ত করলেন।

টিফিনের সময় পর্যন্ত বৃষ্টি পড়ছে, থামার নাম নেই। একপাশে বসে হৈম বাড়ী থেকে আনা দুখানি রুটী আর আলু সেদ্ধ তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়। ছাতাটা সঙ্গ ছাড়া করেনি। মা আর রক্ষে রাখবেন না। হৈম মনে মনে খুশি। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে—আর দিনটা মোটামুটি ভালোই কাটছে।

আজই খাতা দেখা হবে। কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন পরীক্ষার ফল আজই ঘোষণা করবেন, তারপর চতুর্থ মানের ছাত্রীদের মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে, তাকে জেলার অধিকর্তা আজই স্বহস্তে পুরস্কার দেবেন।

হৈম জানে যে যদি পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করতে পারে তবেই আরো পড়াশোনা করতে পারবে, নইলে তার পড়াশোনারও ইতি। এই বাজারে তিনটী ছেলেমেয়ে নিয়ে কারখানার চাকরীজীবি হৈম-র বাবা মেয়েকে আর পড়াতে পারবে না। এই খোলার বাড়ি-ভাড়াই মাসে কুড়িটি টাকা দিতে হয়। তবু ছোট খুকীটার দুধ পাড়ার হাসপাতালের দাতব্য দুগ্ধসত্র থেকে অমনি পাওয়া যায়। হৈম-র ছোটো বোন টুনি একটা ঘটি হাতে করে লইনে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর আর পাঁচজনের মতো সেই পাউডার গোলা দুধ নিয়ে ফেরে।

ম্লান মুখে বাড়ীটার কথাই হৈম ভাবছিল। এমন সময়ে অঙ্কের দিদিমণি এগিয়ে এসে হাসি মুখে বললেন,—ওমা, এই যে, আমি এদিকে সারা স্কুলে খুঁজছি।

পাশ করেছে জেনে বিস্মিত হয়নি, তার বিস্ময় আরো পাঁচটা স্কুল জড়িয়ে সে-ই প্রথম স্থান অধিকার করেছে, নম্বরও পেয়েছে

অনেক বেশী। গত দু'বছর ধরে এই দিনটার কথাই ভেবেছে হৈম। কত কষ্ট, কত দিনের কত পরিশ্রম আজ সফল হয়েছে। বাবা আর কিছু বলতে পারবেন না। হৈমর পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার যে আশঙ্কা ছিল তা আর একেবারেই নেই। পড়াশোনা শেষ করে হৈম একদিন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হবে। অনেক ছাত্রী পড়াবে, বাবার কষ্ট দূর হবে। বুড়ো বয়সে মা একটু শান্তি পাবেন।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাড়ি ফিরছে হৈম। মোড়ের মাথার কাছে পৌঁছে বৃষ্টি থামল। শরৎকালের উজ্জ্বল আকাশ দেখা যাচ্ছে। বাতাসের গতি পরিবর্তিত, সেই সঙ্গে বাংলা দেশের বহুরূপী আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে।

একরকম নাচতে নাচতেই হৈম বাড়ি এসে পৌঁছল। ওর মা রান্নাঘরে নেই হয় ভেতরের ঘরে নয়ত ওপাশের উঠানে।

ওপাশের উঠান থেকেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মা প্রশ্ন করলেন কি রে—হৈম, কি রকম হোলো? ভালো খবর?

—হ্যাঁ মা।

হৈম-র মা বেরিয়ে এলেন। হৈমের মুখে যে আনন্দ ফুটে উঠেছে সে লক্ষ্য করার মতো মানসিক অবস্থা তাঁর নেই। তিনি চতুর্দিকে তাকাচ্ছেন, ঘরের চারপাশ লক্ষ্য করেছেন। তারপর বললেন, সেটা কি হলো?

হৈম এতক্ষণে বোঝে তার মা পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে মোটেই আগ্রহান্বিত নন, সেই বহুমূল্য ছাতার সন্ধান করেছেন। সত্যই তো ছাতাটা গেল কোথায়? হয়ত স্কুলেই ফেলে এসেছে।

তারপর হৈম-র মার সে কি নিদারুণ গালাগাল আর অভিশাপ।

জীবনের কুৎসিৎ কদর্য রূপ স্বপ্ন-বিলাসিনী কিশোরী হৈম-র সমস্ত স্বপ্ন চূর্ণ করে দেয়। এখন আর স্বপ্ন নয়, রূঢ় বাস্তবের সংসারে সে নেমে এসেছে। দরিদ্র সংসারে জলপানির কোনও মূল্য নেই,

সম্মান নেই। বহুমূল্য ছাতাটা যে আর কেনা সম্ভব নয় সেই জ্বালাই বড়ো হয়ে উঠেছে।

একটিও কথা না বলে হৈম গোয়ালঘরের খড়ের গাদায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে।

নূতন নায়িকা

চেয়ারটা আরেকটু সরিয়ে নিয়ে ভালো হয়ে বস্‌লো স্থলোচনা। চিরদিনই এই ষ্টার থিয়েটার তার বিশেষ প্রিয়। থিয়েটার জগতের কত ইতিহাস এই নামটির সঙ্গে বিজড়িত, ড্রপসিনের গায়ে লেখা বিজ্ঞাপনগুলি পড়া শেষ হ'ল, তারপর ষ্টলের দর্শকদের লক্ষ্য কর্‌ল স্থলোচনা। আগেকার মত এখন আর তেমন কনসার্ট নেই, তার বদলে বাজে মাইকের মাধ্যমে রেকর্ড সঙ্গীত। মনে পড়ল, ঐক্যতান বাদন শেষ হওয়ার সঙ্গেই পাদ-প্রদীপের আলো জ্বলে উঠ্‌ত, রঙ্গমঞ্চের সকল কলরব এক নিমেষেই স্তব্ধ হয়ে যেত, তারপর স্থরু হত অভিনেতা-অভিনেত্রীর অগ্নি-পরীক্ষা। কতদিন গান গায়নি স্থলোচনা। আজ সেও একজন সাধারণ দর্শক মাত্র। তবু তার বুকের ভিতর কাঁপন স্থরু হয়।

আজ রাত্রে এই অভিনয় দেখার জন্যে সে বিশেষ চেষ্টা করেই এসেছে, হয়ত আগামীকালই কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে, ঐকতান বাদন নেই তবু আছে স্থরের মাদকতা। এই মর্জিনার ভূমিকায় একদা স্থলোচনার খ্যাতির অন্ত ছিল না, সেদিন বোধ করি সারা শহর ভেঙ্গে পড়ত তার নাচ-গান-অভিনয়ের আকর্ষণে। এখন নাকি নতুন কায়দায় আধুনিক ঢঙে অভিনয় হবে, মর্জিনার পার্ট করছে একটি গ্র্যাজুয়েট মেয়ে, স্থতরাং আজকের অভিনয়ের আবেদনও শ্রোতাদের কাছে কম নয়। আর একটু পরেই যবনিকা উঠ্‌বে তখন বোঝা যাবে সেদিনের সঙ্গে এদিনের কোথায় প্রভেদ! অসহিষ্ণু আগ্রহে প্রায় নিঃশ্বাস রোধ করে বসে আছে স্থলোচনা।

স্থলোচনার মনে হচ্ছে এতক্ষণে সবাই জেনে গেছে বক্সের কোণে যে স্থূলাঙ্গী মহিলাটি বসে আছেন তিনিই স্থলোচনা, একদিন

নৃত্য-কলাকুশলা বাঁদীর ভূমিকায় অনেকের মনে সে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, জনায় জনা, কৃষ্ণকান্তের উইলে ভ্রমর, চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী, ম্যাকবেথে লেডী ম্যাকবেথ,—আর আলিবাবায় মর্জিনার ভূমিকায় সুলোচনাকে আজো কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

যে নতুন মেয়েটি আজ রাত্রে অভিনয়ে নামবে সে যদি সুলোচনার উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে থাকে তা'হলে নিশ্চয়ই অস্বস্তি বোধ করবে। আজ তার প্রথম রজনী।

প্রোগ্রামের পৃষ্ঠা অন্যমনস্কভাবে ওল্টাচ্ছে সুলোচনা আর কত কথা তার মনে পড়ছে। প্রোগ্রামে মেয়েটির ছবি ছাপা হয়েছে, গাইতে বা নাচতে নিশ্চয়ই পারবে নইলে ওকে এরা নেবে কেন, কিন্তু চেহারাটা কি তেমন মানানসই? মর্জিনাব পার্ট—হলেই বা গ্র্যাজুয়েট, কথাটা ভাবতেও সুলোচনার ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

ওব সময়ে অবশ্য অবস্থা অন্যরকম ছিল। শুধু যে ওকে দেখতে ভালো ছিল তা নয়, প্রকৃতিগত উচ্ছ্বলতা ও তারুণ্যের উদ্দাম আবেগে ভূমিকাটিকে সে প্রাণরসে সঞ্জীবিত কবেছিল। আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারেই নায়িকার সাফল্য। অভিনয়ে সার্থকতা সৃষ্টির জন্য সুলোচনা যেন নিজেই মর্জিনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। সুযোগ পেলেই এই সব অতীত কাহিনী সুলোচনা সকলকে শোনায়, এতটুকু গোপন করার চেষ্টা নেই তাব।

মাইকের আওয়াজ থাম্‌লো, রঙ্গমঞ্চের ভেতর আবহ সঙ্গীতের ক্ষীণ মূর্চ্ছনা ভেসে উঠলো,—সুলোচনার হৃদয় বুঝি আজ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, এ কি অশান্ত কল্লোল! উইংশের পাশে দাঁড়িয়ে এমনই সুর শুন্‌তে শুন্‌তে গভীর আতঙ্কে অধীর হয়ে উঠেছে সুলোচনা, গলা শুকিয়ে গেছে, অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌লো সুলোচনা—সামনেই বিরাট জনসমুদ্র, তারা ওর মুখ চেয়ে বসে আছে, ত্রুটির সন্ধানেই যেন তারা এত শ্রম করে এসেছে। সুলোচনার কণ্ঠস্বর, স্নায়ু এবং স্মৃতি সবই যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে যেত।

কিন্তু যেই তার সময় আস্‌ত, ষ্টেজ থেকে শেষ কথা বলে আগের অভিনেতা যেই সরে যেতেন অমনই প্রম্পটার ইঙ্গিত করত, তখনই ষ্টেজের উপর চলে আস্‌ত সেদিনের মুকুলিকা বালিকা-বয়সী সুলোচনা, —সে যেন তখন অন্য জগতে চলে গেছে, আরব্য রজনীর পৃষ্ঠা থেকে কেটে আনা এক জীবন্ত নায়িকা।

হাত বদল হওয়ার পর নতুন কর্তৃপক্ষ রঙ্গমঞ্চটির সংস্কার করেছেন—আলোর কায়দা বিশেষ করে লক্ষ্য করার মতো। ধীরে ধীরে সেই আলো কেমন যেন ম্লান হয়ে এল, যবনিকা উঠছে, প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সেট দেখে সুলোচনার অন্তর অতীতের বেদনায় আকুল হয়ে উঠল। ফতিমা, সাকিনা বেগম সবই কেমন ম্লান ভূমিকা, চিরদিন এই পার্টগুলো অবজ্ঞা করে এসেছে সুলোচনা, আলিবাবার পরেই আবদাল্লা। আর শুধু পরে কেন, আবদাল্লা সবাইকে কেমন ঠাণ্ডা করে দেয়। যে-দীর্ঘদেহ ছেলেটি আবদাল্লা করছে, মন্দ নয়, তাকে দেখে হাসি পায় সুলোচনার। ছেলেটি সুন্দর বটে, গলাটাও বেশ, ওদের সময় অভিনয় নৈপুণ্যের সঙ্গে সুচেহারার একটা মূল্য ছিল। এদিকে কি অবস্থা কে জানে, বোধ হয় বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ডিগ্রীটাই মাপকাঠি। দুঃখ হয় সুলোচনার। কুড়ি বছর আগে হলে এই ছোকরার মুখের গানে প্রাণ আনতে পারতো সুলোচনা। কথাটা ভাবতেও তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

আজকের এই নতুন নায়িকাকে দেখে কি আবদাল্লার প্রাণে সেই স্বর্গীয় প্রেরণা জাগবে? নতুন মেয়েটিকে চোখে না দেখলেও তার গুণাগুণ সম্পর্কে সুলোচনার এতটুকু জানতে বাকী নেই। সুলোচনা কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। কি নিদারুণ অস্বস্তি!

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে মেদবহুল হাতের হীরকখচিত ব্রেস-লেটটি অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করে সুলোচনা। অনেকদিন আগে

প্রতাপচাঁদ এই ব্রেসলেট জোড়া দিয়েছিল তাকে। সেদিন সুলোচনার বয়স অনেক কম ছিল, খ্যাতি কিন্তু কম ছিল না। প্রতাপচাঁদের ভারী ঝোঁক ছিল থিয়েটারে, পয়সাও ছিল। রামচন্দ্রপুরের বড় তরফ—শুধু যে থিয়েটারে এসে মুক্ত হস্তে টাকা ঢাললেন তা নয়, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীটিকেও হাত করলেন।

আর সুলোচনা শুধু যে ভালো অভিনেত্রী ছিলেন তা নয়, ব্যবসা বুদ্ধি তাঁর প্রখর, তাই ভেবেছিল রামচন্দ্রপুরের বড় তরফ প্রতাপচাঁদকে বিয়ে করে একেবারে হাতের মুঠোয় রাখবে। আরো কয়েকটি সুন্দরী অভিনেত্রীর ঈর্ষা এবং জ্বালা বাড়িয়ে একদিন প্রতাপচাঁদের সঙ্গে সুলোচনার রেজেষ্ট্রী করে বিয়েও হয়ে গেল।

সবই বেশ পরিকল্পনা মাফিক চলছিল, কিন্তু উন্নতির সর্বোচ্চ ধাপে ওঠার সময় সুলোচনা একদিন আবিষ্কার করলো সে জননীত্বে অভিষিক্ত হতে চলেছে।

আরো অনেকের মতো ওর অন্তরেও গার্হস্থ্য মনোভঙ্গীর অভাব ছিল। ফলে খানিকটা অবুঝের মতোই প্রতাপচাঁদের সঙ্গে কলহ সুরু হোল, আর সন্তান জন্মের কিছু পরেই উভয়ের বিবাহ বন্ধন এক কথায় ছিন্ন হয়ে গেল। প্রতাপচাঁদের আগ্রহে নবজাতকে রভার তারই হাতে ছেড়ে দিয়ে সেদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল সুলোচনা। এর পর থেকে সুলোচনার প্রেমলীলা তার খ্যাতির প্রচারমূল্যের মুখ চেয়েই চলেছে। সারা দেশ সে ঘুরেছে। ষ্টেজ থেকে সিনেমায় গিয়ে পয়সা পেয়েছে প্রচুর। অলঙ্কার আর অহঙ্কার দুইই সমান তালে বেড়েছে, ভক্ত, মিত্র এবং শত্রুর সংখ্যাও কম নয়। নিজের আসন সুদৃঢ় করতে প্রয়োজনবোধে দু'পায়ে তাদের পিষতেও বাধেনি সুলোচনার। সেদিনের সুলোচনা—

হল্‌দে-রঙের পোষাক-পরা দীর্ঘদেহ আবদাল্লাকে দেখে মনে পড়ল অরবিন্দ দেব-বর্মাকে। জলপাইগুড়িতে একবার অভিনয় করতে গিয়েছিল ওদের পার্টি, সেইখানেই অরবিন্দ এসে কি করে ভিড়ে

যায়। সুলোচনা তার আগে অনেকবার প্রেমে পড়েছে, হাজার মরণে মরেছে, সহসা মাথা খারাপ করার মত কাঁচা মেয়ে সে নয়, এই ত্রিপুরাবাসীকেও সে আমল দেয়নি ; লোকটির বয়সটাও কম নয়, তা ছাড়া ওর চেয়ে অনেক সুদর্শন পুরুষ সুলোচনার চরণে আত্ম-সমর্পণ করতে সর্বদাই প্রস্তুত।

তবু কি যে হ'ল, সুলোচনার হৃদয়ের কাছাকাছি রয়ে গেল এই দেব-বর্মা। সুলোচনা অবশেষে এক সময় বুঝেছিল, তার মনের মানুষ হওয়ার যোগ্যতা এর আছে।

চমৎকার গলা ছিল লোকটার, প্রথম দিকটায় কথায় একটা আঞ্চলিক টান ছিল, পরে সেটাও মুছে গেল। তারপর নাটক সম্পর্কে ছিল তার অসাধারণ জ্ঞান, নাট্যবসবোধ প্রবল, তাই সহজেই থিয়েটারে তার প্রভাব বিস্তারিত হল—এক শুধু সুলোচনা ছাড়া আর সবাইকে ম্লান করে দিল দেব-বর্মা। এক জায়গায় মিল ছিল দু'জনার মধ্যে, উভয়ের মনে ছিল প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা,—আর ছিল অসামান্য সঙ্গীত-রসপিপাসা।

খানিকটা কূটনীতি হিসাবেই তাকে স্বপক্ষে টানার চেষ্টা করল সুলোচনা, ওর উদ্দাম এবং স্বার্থপব প্রকৃতিব সঙ্গে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র ছিল সুলোচনাব। এক সপ্তাহের ভেতরই জানা গেল সুলোচনা আর দেব-বর্মা দুজনেই প্রেমের পবশে আচ্ছন্ন।

এ এক অদ্ভুত আত্মীয়তা,—সুলোচনার এত সব সুচিন্তিত পরিকল্পনা কোথায় বান্‌চাল হয়ে গেল। জীবনে যেন সে এই সর্বপ্রথম প্রেমের পুলক-স্পর্শ অনুভব করল। দলের সকলেই ব্যাপারটি জান্‌লো এবং লক্ষ্য করতে লাগল কখন কি প্রতিক্রিয়া ঘটে। তবে সকলের মনেই একটা সংশয় রয়ে গেল—দেব-বর্মাও কি সুলোচনাকে ভালবাসে ? রঙ্গমঞ্চে ওদের অভিনয়ের মধ্যে ছিল এক উন্মাদ ঈর্ষা— তবু সুলোচনার তাতেই আনন্দ। এদিকে ভাবজগতে যাই ঘটুক না, একটি বিষয়ে কেউ কারো কাছে এতটুকু নতি স্বীকার করলো না,

দু'জনের অদম্য উচ্চাভিলাষ যেন অদৃশ্য প্রাচীরের মত দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিল। দু'জনেরই মেজাজ চড়াসুরে বাঁধা,—ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা আর রিহার্সেলের সময়কার ব্যবহার মাঝে মাঝে সুলোচনাকে বিশেষ উৎপীড়িত করে তুল্‌তো, সে বুঝলো তার গানের গলা হয়ত এর জন্য নষ্ট হতে বসেছে।

সুলোচনা তার অতীত জীবনের এই পর্যায়টুকু চিন্তা করতে পারতো না, তার জীবনে অনেক অন্যায়, অনেক নিষ্ঠুর কর্ম, অনেক হঠকারিতা সে করেছে, কিন্তু এই অংশটুকু যেন আজো তার বিবেককে দংশনে জর্জরিত করে তোলে, এ তার কিছুতেই সয় না।

সেই বছর পূজোর সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল দেব-বর্মা। সুলোচনার সুযোগ মিলল। সুলোচনা সেই জাতের স্ত্রীলোক যারা চট্‌ করে মনস্থির করে ফেলে আর তাড়াতাড়ি কাজ করে।

সুলোচনা কর্তৃপক্ষকে জানালো এখনই আর একজন কাউকে পাকাপাকিভাবে ঐ ভূমিকা দেওয়া হোক্‌। সে আর দেব-বর্মার সঙ্গে অভিনয় করবে না—একদিনও না। সুলোচনা আজো ভুল্‌তে পারেনি এই সংবাদ শোনার পর দেব-বর্মার মুখের কি অবস্থা হয়েছিল,—আর ভুলবে না উভয়ের একত্রে অভিনীত শেষ-রজনী।

অভিনয় শেষে একবার তার মনে হয়েছিল বুঝি আবদাল্লা তার বুকেই ছুরি বসিয়ে দিল—তাই সেদিন সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিল, আর অর্থ না বুঝে সাধারণ দর্শক প্রচণ্ড হাততালি দিয়েছিল।

দল ছাড়ার পর দেব-বর্মার কোনও খবর অনেক বছর ধরেই পায়নি সুলোচনা। পরে শুনেছিল তার গলা নষ্ট হয়ে গেছে, এবং তার নামও নাট্য-জগৎ থেকে মুছে গেছে।

ওঃ তখনকার মানুষ,—স্ত্রী-পুরুষ সবাই কি যে ছিল! দেব-বর্মার মতো অমন কিন্নরকণ্ঠ কি আর রঙ্গমঞ্চে পাওয়া গেছে? আজকের

আর্টিষ্টরা মধ্যম শ্রেণীর মানুষ,—অভিনয় যে অভিনয় তা সহজেই বেশ বোঝা যায়। সুলোচনাদের সময়কার সেই আগুন, সেই প্রাণ আজ কই! আর ঠিক সেই কারণেই আজ 'সাক্‌সেস্‌' বলে কিছু নেই। একশো নাইট হলেও নয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত ষ্টেজের ওপরকার নাটকীয় সংঘাত লক্ষ্যই করেনি সুলোচনা, মাথায় তার ব্যক্তিগত চিন্তার বোঝা, এইবার কিন্তু উইংসের দিকে নজর পড়েছে। এখন মর্জিনার প্রবেশ।

ঝুঁকে বস্‌ল সুলোচনা—ষ্টেজের ওপরকার ছোট্ট প্রাণীটির প্রতি তার ঘৃণা আর ঈর্ষার সীমা নেই। মেয়েটির ভঙ্গীও মন্দ নয়, কেমন যেন একটা মার্জারসুলভ হালকা বিলম্বিত গতি,—ধীরে এসে সে ষ্টেজের মাঝখানে দাঁড়ালো।

প্রথমেই সুলোচনার লক্ষ্য পড়ল ওর পোষাকটা শাদা আর কালোয় তৈরী, এক রকম ভালোই হয়েছে, তার ফলে মঞ্চের আর সকলের চাইতে দৃষ্টিটা ওর ওপরই বেশী করে পড়ছে। কালো-চুলের ওপর শাদা ফুল, কি চমৎকার চুল! নিশ্চয়ই নকল চুল, তাচ্ছিল্য-ভরে পানের-কৌটো থেকে একটি পান মুখে ফেলে দেয় সুলোচনা।

কিন্তু আবদাল্লা আর মর্জিনার প্রথম গানখানা বেশ জমে গেল, গানের ভিতরকার বৈচিত্র্য এবং সুরের বৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর মনে হ'ল।

এই চরিত্রটি গত ত্রিশ বছর ধরে একইভাবে অভিনীত হচ্ছে, মর্জিনা চপল, দুষ্ট প্রকৃতির, তবু পুরুষরা তার ওপর আকৃষ্ট হয়, তার মধ্যে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। তার হৃদয়ে মানবীয় প্রেম ও করুণা আছে, এই দুটি সদ্‌গুণ গোপনে সুলোচনা নিজের মধ্যেও আবিষ্কার করেছে—তার ধারণা এতদ্বারা রাশি রাশি পাপ তুলোর মত উড়িয়ে দেওয়া যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলো সুলোচনা যেমনটি ভেবেছিল এ ত' তা নয়, অতীতের অক্ষম অনুকরণ-মাত্র নয়—যে ভূমিকার রূপদানে সুলোচনা তার জীবনের সব-কিছু শক্তি ঢেলে দিয়েছিল, এই নতুন

মেয়েটির অভিনয়ের সঙ্গে তার মিল নেই, তবু কোথায় যেন একটু যোগ রয়েছে, কোথায় মিল রয়েছে, কিন্তু তা ধরা যাচ্ছে না। দর্শকরাও বোধ করি ঠিক ধরতে পারছে না, তারা বুঝছে না যে এই মেয়েটি সম্পূর্ণ নতুন,—আজই সে সর্বপ্রথম নায়িকার ভূমিকায় নেমেছে। সে যেন চিরদিনের চিরপরিচিত মর্জিনা।

চুপ করে বসে আছে সুলোচনা, রাগে দুঃখে তার বুক ফেটে যাচ্ছে। তবু মেয়েটির অভিনয়ে সে মুগ্ধ না হয়েও থাকতে পারছে না। চমৎকার অভিনয়, ভঙ্গিমাও অপূর্ব। সব যেন অতি পরিচিত, রঙ্গমঞ্চের ঐ নতুন নায়িকা যেন সুলোচনার অতীত যৌবন।

পরবর্তীর দৃষ্টিতে সুলোচনা।

দ্বিতীয় অঙ্কের পর কি প্রচণ্ড হাততালি। সুলোচনা বুঝলো এইবার তার অতীত গৌরব, অভিনয়-খ্যাতি, সব মুছে যাবে, নতুন নায়িকা রীতিমত সাক্‌সেস্।

এ যে অতি নির্মম অপমান! কিন্তু দাম্ভিক সুলোচনা চুপ করে বক্সে বসে আছে। তার অনুকৃতির এই সাফল্যের ফলে সে যদি এখন উঠে চলে যায় তাহলে যে সবাই হাসবে। দৃঢ়চিত্ত সুলোচনার। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অসীম ক্ষমতা তার, তাই সে শেষ অঙ্ক পর্যন্ত দেখে যাওয়ার জন্য চুপ করে বসে রইল।

শেষ অঙ্কে—চাঁদ ও চকোর গান হচ্ছে,—সারা হাউস স্তব্ধ হয়ে বসে আছে,—এই কলকাতা শহরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও সেই পুরাতন আলিবাবা! দর্শকজন অত্যন্ত পরিতৃপ্ত। সুলোচনার কেবল মনে হয় ঐ যেন সেই মর্জিনা।

একদিন প্রতাপচাঁদের কাছ থেকে অনেক টাকার বিনিময়ে বিয়ের গাঁটছড়া থেকে তাকে সে মুক্তি দিয়েছিল।

দেব-বর্মাকে অকারণে পথে বসিয়েছে, শুধু নিজের রঙ্গমঞ্চের জীবন, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়। এই তার জীবনের শেষতম প্রেম-লীলার শেষ অঙ্ক।

একদা বাংলাদেশের বাইরেও যার সুনাম ছিল আজ সে নগণ্য রমণী।

যবনিকা পড়লো, সেই সঙ্গে আবার হাততালি। বিলাতী কায়দায় সমস্ত নট-নটী যবনিকার পাশ থেকে অভিনন্দন গ্রহণ করে অভিবাদন জানালেন। বারবার মর্জিনার নাম উচ্চারিত হল। হাত দু'টি জোড় করে মেয়েটি ব্রীড়ানম্র ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে—আর তার সে চাপল্য নেই।

গ্রীন-রুমের পথে ষ্টেজের ভেতর ঢুকে পড়ল সুলোচনা, দরজার সামনে অটোগ্রাফের খাতা হাতে কয়েকটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, বুড়ো দরোয়ান সুলোচনাকে চিনত, সসম্ভ্রমে একটা সেলাম দিয়ে পথ ছেড়ে দিল। সে সব লক্ষ্য করার মতো অবশ্য তার মনের অবস্থা নেই।

যে ড্রেসিং রুমটায় সুলোচনা দীর্ঘদিন বসে মেক্‌আপ করেছে, আজকের এই নতুন নায়িকা সেই ঘরেই এসে বসেছে। বাইরে থেকেই ঘরের ভিতরের উল্লাস আর অট্টহাস্য শোনা যাচ্ছে,—দরজাটা খুলতেই কলরব আরো চড়া সুরে কানে বাজলো।

ঘরের ভিতর রঙ্গজগতের অসংখ্য হোমরা-চোমরা সমালোচক এবং পৃষ্ঠপোষক দাঁড়িয়ে। এঁরা অনেকেই সুলোচনার পরিচিত। সুলোচনা তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো, সেই পুরাতন মিষ্টি হাসি। আর সকলের মতই কয়েকটা অভিনন্দনের বাণী তার মুখেও প্রতিধ্বনিত হ'ল।

সত্যি সেও ত' খুসী হয়েছে। এমন সাক্‌সেস্‌, প্রথম রজনীর সাফল্য। তার মত খুসী আর কে হবে, এটুকু ঔদার্য তার আছে।

এত রূপ ও টাকা সত্ত্বেও থিয়েটারের অন্দর মহলে সুলোচনার জনপ্রিয়তা ছিল না, বহুজনে তার সংস্পর্শে এসে ঠকেছে—আঘাত পেয়েছে, সুতরাং সুলোচনার শত্রুর সংখ্যা অসংখ্য। সুলোচনা হাসল, কথা বলল—শুধু গণ্যমান্যদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়ে আলোচনা

করলে, অপরিচিত আর অল্প পরিচিতদের উপেক্ষা করল। সুলোচনা ভাবে অপরিচিতদের মধ্যে ক'জনই বা তাকে জানে, ক'জন তার অভিনয় দেখেছে।

সুরকার রাধানাথ বাগচী সুলোচনার গলা এবং সুরজ্ঞানের যেমন প্রশংসা করতেন মনে মনে তাকে তেমনই ঘৃণা করতেন।

সুলোচনার চোখের আগুন দেখে যদি ওর মনের ভাব উনি বুঝে ফেলেন, আজকের এই পরাজয়ের গ্লানি কি ওর মুখে ফুটে ওঠেনি—উনি যদি তা বোঝেন—কি লজ্জার কথা, কি অপমানের কথা! তাই সুলোচনা হাসছে,—মনের ভাব চাপার চেষ্টা করছে যদি এইভাবে চতুর রাধানাথ বাগচীর চোখে ধুলো দিতে পারে। প্রশান্ত মুখভঙ্গীতে তাই প্রসন্নতার ছাপ আনার জন্য সে সচেষ্ট।

তবু আত্ম-বিশ্বাস নেই, তাই তাঁকে অতিক্রম করে 'দৈনিক দেশমাতা'র কলা-সমালোচকের কাছে এগিয়ে গেল। কলা-সমালোচক স্মিতহাস্যে সুলোচনার পানে তাকালেন, বললেন—"আপনি ত' আজকাল ভুবনেশ্বরে আছেন না?"

"না, অনেকদিন ফিরে এসেছি।" বলে অকারণে হাসল খানিকক্ষণ সুলোচনা।

সুলোচনার চাপা ঈর্ষা ওর চোখে ঠিক মত ধরা পড়েছে, কারণ ষ্টেজের ব্যাপারে সুলোচনার দুর্দান্ত ঈর্ষার কথা সকলেই জানে। এমন কর্ম নেই যা সুলোচনা তার সুসময়ে করেনি, অপরকে বধ করতে তার বাধেনি কোনোদিন।

সেই জনবহুল ঘরটিতে সেই সময় যে অভিনয় করল সুলোচনা তার সমগ্র অভিনেত্রী জীবনে, এমন কি রঙ্গমঞ্চেও সে কাজ সে করতে পারেনি কোনদিন। ভীড় ঠেলে যাওয়ার সময় সুলোচনা বলল—"গতানুগতিক পথ ছেড়ে নতুন ভাবেই ত' সব কিছু করতে হবে। প্রযোজকের ব্যক্তিত্ব আছে, নতুন মেয়েকে নিয়ে এতবড় দুঃসাহসিক কাজে নেমেছেন।"

যাকে সুলোচনা খুঁজছিল সে ড্রেসিং টেবলের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির গায়ে এখনও ষ্টেজের পোষাক—এখনও মর্জিনা। একটি বৃদ্ধলোক পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তার সঙ্গেই এক-মনে কথা বলছে। বৃদ্ধ স্নেহভরে তার কাঁধে হাত রেখে সব শুনছেন।

সুলোচনা গভীর ঘৃণাভরে মেয়েটির দিকে তাকালো, প্রতাপচাঁদের মত দেখতে মেয়েটিকে,—প্রতাপের সৌন্দর্য নেই, নেই সুলোচনার মত কণ্ঠস্বর, তবু যেন কোথায় একটা দীপ্ত মর্যাদামণ্ডিত ভঙ্গী রয়েছে, সুলোচনার বিবাহিত জীবনের শ্রেষ্ঠতম দুর্ঘটনা। এই তার মেয়ে, তা ই—"

নূতন নায়িকা মুখ তুলে চায়, জ্ঞানে হয়ত কখনো দেখেনি, তবু ভীড় ঠেলে মহিলাটিকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তার মুখটি কাগজের মত শাদা হয়ে যায়। মেক-আপের প্রলেপও সেই পাণ্ডুরতা চাপা থাকে না।

ভয় যতই হোক্, সুলোচনার শান্ত আলিঙ্গনে কি যে স্বস্তি ছিল কে জানে, নূতন নায়িকার চোখের কোণে জল এল। মেয়ের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন প্রযোজক, সুলোচনা অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে তাঁর প্রশংসা করল,—কিন্তু পাছে আবার ভেঙে পড়ে সে, পাছে ধরা পড়ে তার মনের নীচতা, সে তাড়াতাড়ি চলে যাবার উদ্যোগ করে।

ঘর থেকে বেরোবার সময় সত্যি তার পা কাঁপছে। যে লোকটি ড্রেসিং রুমের দরজা খুলে দিল তার পানে তন্দ্রাচ্ছন্নের মত তাকালো সুলোচনা—এই সেই ম্যানেজার, আজকের নাটকের নতুন প্রযোজক, সুলোচনা তাড়াতাড়ি দরজাটা আঁকড়ে ধরে, সে যে পড়ে যাবে, পায়ের নীচের মাটি সত্যি কি সরে যাচ্ছে ?

পাকা চুল আর কুড়ি বছরের বিবিধ বিপর্যয় সত্ত্বেও এই পরিচিত মানুষটি ভুল হওয়ার নয়, সুলোচনা তাঁকে চিন্‌তে পেরেছে।

এই সেই দেব-বর্মা !

দরোয়ান নীরবে লক্ষ্য করলো অতি ধীরে ধীরে জ্বরগ্রস্তের মত চলে যাচ্ছে সুলোচনা, এবার তার সেলাম আর চোখে পড়লো না।

যখন ভেতরে গিয়েছিলেন তখনও কি এমনই প্রাচীন মনে হয়েছিল ? কে জানে, দরয়ানেরও বয়স অনেক হ'ল।

পাখির বাসা

সেলের খুব কাছেই ফাঁসীর মঞ্চ। কারা-কর্তৃপক্ষের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়,—বেশ বিবেচনা করেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে মনে হয়। হত্যার জন্য এক মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার মানে হয় না। ফাঁসীর হুকুম হলেই তাই এই ঘরটিতে আসামীকে আট্‌কানো হয়, মানবিকতা কথাটি শুধু ভালো যে তা নয়, কথাটাও বড়ো। তাই আসামীর খাতিরে একটু মানবিকতার স্পর্শও চাই। ফাঁসীতে লট্‌কানোর আগে বেশ করে দেখে নাও জ্বর আছে কিনা, প্রশ্ন করো কি তার শেষ সাধ। তা ছাড়া হয়ত এই ব্যবস্থাটুকুর আরো একটা যুক্তি-সঙ্গত দিক আছে, যদি ঐ আসামীকে শোভাযাত্রা সহকারে ফাঁসীমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে অন্য আসামীরা হৈ চৈ করবে,—ঠাট্টা করবে, চেঁচাবে, সেও এক বিশ্রী কাণ্ড। পূর্ণচন্দ্র আকাশে উঠলে যেমন কুকুররা ঘেউ ঘেউ করে, এই কলরবও তেমনই কর্কশ মনে হয়।

আরো একটা কারণ আছে, যাদের এই ফাঁসীর হেপাযত সাম্‌লাতে হয়, যে ফাঁস টানে, যারা পরিদর্শক, তারাও সব কাছাকাছি থাকে। জেলার সাহেব, ডাক্তার, ওয়ার্ডার এবং ঘাতক, এই বিশেষ ঘটনায় সকলেরই সমান দায়িত্ব। মৃত্যুপথ যাত্রীর মনের ছায়া হয়ত সকলের মাঝে পড়ে,—কি তারা ভাবে কে জানে? কারণ—যে ফাঁসীতে ঝুল্‌ছে সে ত' তার মনের কথা বলে যেতে পারে না।

একদা প্রাতে এমনই এক আসামীর ঘুম ভাঙলো, এদেশের এক বন্দীশালায়।—দীননাথের কাল সারারাত অতি সুন্দর ঘুম হয়েছে, কিন্তু ঘুম ভাঙতেই মনে এল—"এই সেইদিন, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন।" এখনও ভালো করে রাত্রি প্রভাত হয়নি,—আকাশের কোণে

কোণে অন্ধকার রয়েছে, তবু গরম কাল, তাই পূর্বদিক বেশ ফরসা হয়ে এসেছে।

এই দিনটি মনের মধ্যে শুধু যে নিরাশা এনেছে তা নয়, এনেছে আশার আনন্দ। নিরাশার কারণ আজই এই জীবনের শেষ, আর আশার কারণ এই যে, বাঁচার যখন আর কোনই সম্ভাবনা নেই তখন এ জীবন যত শীঘ্র শেষ হয় ততই মঙ্গল। এই কথাটি মনে হওয়ার অর্থ তার ঘুম ভেঙেছে। এই কারাকক্ষ এমনই পরিচিত যে এই নির্জন গৃহকোণটিকে প্রিয়তমার শয়নকক্ষ বলে ভুল করার কোনও কারণ নেই। দীর্ঘদিন কারাবাসে তাই আর বিস্ময় নেই।

মন থেকে কিছুতেই কিন্তু তার ভার নাম্‌ছে না, কেমন একটা আচ্ছন্ন মনোভাব,—ঘুমের ঘোর কি কাটেনি! না অবসাদ তাকে এমন অক্ষম করে তুলেছে?

ঘুমের মাঝে যে স্বপ্ন দেখছিল সেই স্বপ্নই এই মনোবিকারের কারণ। স্বপ্নে সে সোনাব অতীতে বিচরণ করছিল, তার সেই শৈশবের সোনা মাখানো দিন, আর তার বিচিত্র ঘটনা সবই ছায়াচিত্রের মত মনের পটে ভেসে এসেছে। অথচ এতদিন সেকথা তার মনে জাগেনি, সম্পূর্ণ বিস্মরণ ঘটেছিল। কঠিন কারাশয্যায় শুয়ে, ভোরের আধো আলো আধো অন্ধকারে ছেলেবেলার কথাই মনে পড়ে, কারণ স্বপ্নের ঘোরে দীননাথ যা দেখেছে তা স্পষ্ট, কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই।

অতীতের স্মৃতি তার অন্তরকে তাই স্পর্শ করছে। এই স্বপ্নময় ঘটনা বর্ণনার জন্য কোনো ভাষার প্রয়োজন নেই, শুধু সে বোঝে কি অপূর্ব তার অভিজ্ঞতা, কি বিচিত্র তার অতীত।

কিসের এই স্বপ্ন? বনপথ,—কত অদ্ভুত নাম না জানা গাছ আর পাতার ভীড়,—তার ভেতর আছে ছোটখাটো পানাভরা ডোবা, তার পাশে বেত বন, সেই সঙ্গেই মিশিয়ে আছে দেশী কুলের গাছ। কতদিন এইসব কুলগাছে চড়ে কুল পেড়ে খেয়েছে,—বাল্য জীবনের

সঙ্গীর সঙ্গে পাখির বাসার সন্ধানে এসে নির্জন বনের নিদারুণ শূন্যতা আর নিবিড় মমতায় মন ভরে উঠেছে।

এই সেই বন,—মুরোদপুরের জঙ্গল, জঙ্গল পার হ'লেই, বিরাট জলা। চাল্‌তা গাছ, কাঁঠাল গাছ, কদম গাছ, সব পাশা-পাশি, সেই সঙ্গে বাঁশবন। গাছের ডালের ভেতর আছে পাখির ডিম। দীননাথ পাখির ডিমের সন্ধানে এসেছে। পাখিটাও অদ্ভুত, সোনালী পাখি, কত রকমের রঙ তার গায়ে, যেন রামধনু। এরকম পাখি আর দেখে নি দীননাথ, পাখিটা ওদের ডাক্‌লো, নিজের বাসায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল, কি অদ্ভুত পাখি, কোন্ দেশে থাকে...? সোজা কয়েকটা ডিম বেছে নিয়ে হাতের মুঠোয় ভর্‌লো দীননাথ,—

কিন্তু এ সব কথা সে ভুলেছিল কেন ? কে জানে ? জীবনের এই-সব মধুর অভিজ্ঞতার কথা যদি মনে থাক্‌তো তাহ'লে জীবনটা হয়ত অন্যপথে প্রবাহিত হ'ত,—উত্তরকালের শোক আর দুঃখের ভীড়ে এই সোনালী অতীত কখন কোথায় মিলিয়ে গেছে কিছুই আর মনে নেই দীননাথের।

সেই ছোটবেলায় আলাপ হয়েছিল দিবাকর দা'র সঙ্গে। দিবাকর বয়সে অনেক বড় ছিল, জ্ঞানও ছিল অনেক বেশী। একদিন ভোর হওয়ার আগে এই দিবাকরদাকে ডেকে তুলেছিল দীননাথ।

দিবাকর বলেছিল, তোকে একটা মজার জিনিষ দেখাব দীনু। চেয়ারের ওপর উঠে—আলমারীর মাথা থেকে একটা জুতার বাক্স বার করলো দিবাকর। বাদামী রঙের বাক্স,—অতি সন্তর্পণে নামিয়ে বল্‌ল—"এটা কি বল্‌তো ?"

বিস্ফারিত নয়নে বালক দীননাথ তাকিয়ে রইলো দিবাকরের মুখের দিকে। তারপর যা দেখলো তাতে বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না। বাক্সটা করাতের গুঁড়ো দিয়ে বোঝাই,—সেই করাতের

গুঁড়োর ভেতর রয়েছে নানা রকমের কয়েকটি ডিম। নীল রঙের ডিম, কোনোটি একেবারে শাদা, কোনটির গায়ে বিন্দু বিন্দু দাগ। কোনোটির আকার অতি ছোট্ট এবং সবুজ। কোনোটা পাখির চোখের মত ছোট্ট, কোনোটি চৌকীদারের কপালের আবের মত প্রকাণ্ড।

দিবাকর বল্‌ল—"একটা হ'ল রক পাখির ডিম, সেই যে আরব্য উপন্যাসে পড়েছিস্, আর এইটা হ'ল পেঁচার ডিম, লক্ষ্মী পেঁচার ডিম।"

প্রতিটি ডিমের নাম অতি দ্রুতগতিতে বলে গেল এবং বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বল্‌ল। কে তার কথার প্রতিবাদ করবে।

পাখির ডিম থেকে চোখ তুলে দিবাকরের গম্ভীর মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায় দীনু। কত জলায় ঘুরছে দিবাকর, কত গাছের ডগায় উঠেছে তবে ত' বিচিত্র ডিমগুলি সংগ্রহ করছে। ধন্য এই দিবাকর! কত জঙ্গল আর জলায় পরিভ্রমণ করে এই রত্নসম্ভার আহরণ করছে দিবাকর, কে তার হিসাব রাখে!

যারা শোনে তারা এই অবস্থায় স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দীননাথও তাই করলো। তার আর কিছুই করার নেই, এই সব অপূর্ব কাহিনী সে চুপ করে শোনে। করাতের গুঁড়োয় ছোট্ট হাত ঢুকিয়ে ডিমগুলো স্পর্শ করে একটু আনন্দের স্বাদ নেয়। এত সাবধানে সে ডিমে হাত দেয়।

সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটির কাছে সেই রঙীন ডিমগুলি ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়।

ডিমগুলো শুধু চোখে দেখে আনন্দ নেই, ছুঁতে ইচ্ছে করে, হাত দিয়ে ধরে বুকে রাখতে ইচ্ছে করে! আরো নিবিড় করে, একান্ত আপনার করে পেতে মন চায়। সেই অকিঞ্চিৎকর বস্তু তার কাছে সাত রাজার সম্পদ।

দিবাকর সেদিন বলেছিল সেই আশ্চর্য দেশের কাহিনী, সেখানে শুধু চাঁদ ওঠে আর ফুল ফোটে নয়, পাখিরা দেশ, পাখিরা জড়ো হয়ে ডিম পাড়ে, লাল নীল হল্‌দে,—কত বিচিত্র তার রঙ।

অতি মিনতি করে দীননাথ বলে—"আমায় নিয়ে যাবে দিবাকরদা আমি তোমার চাকর হয়ে থাকবো।"

"আচ্ছা, সামনের শনিবার।" দিবাকর প্রতিশ্রুতি দেয়।

আজকের এই আসামী দীননাথ সেই নির্দিষ্ট শনিবারে দিবাকরের বাড়ির সামনে এসে হাজির হল। দিবাকরের মাথায় একটা রুমাল বাঁধা, তার তখন পনের বছর বয়স রীতিমত মুরুব্বী, হীরু ঘড়ি-ওয়ালার দোকানে কাজ শেখে ছুচার টাকা মাইনেও পায়। সেই টাকা জমিয়ে একটা পুরনো সাইকেল কিনেছে।

ঘড়িওয়ালার সাকরেদ দিবাকর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। একেবারে শেষ অংশটুকু পর্যন্ত সুখ টানে পুড়িয়ে তবে তার আনন্দ। আঙুলটা পুড়ে যাবার উপক্রম।

অতি মৃদু গলায় দীননাথ বলে—"দিবাকরদা, মা কিছু নাড়ু তৈরী করে দিয়েছিল, নিয়ে এসেছি।"

দিবাকর হেসে বলে, "এখন কি আর নাড়ু ভালো লাগে রে? সায়েবেরা সব ডিম, পাঁউরুটি, মাখন নিয়ে যায়। যাক্, বেশ করেছিস্।"

দীননাথের মাথায় রুমাল বাঁধা নেই। তার লম্বা লম্বা চুল কপালে এসে পড়েছে। দিবাকরের বাইসিকলের পিছনে সে দাঁড়িয়ে, এক হাতে তার কাঁধটা জড়িয়ে ধরেছে।

দিবাকর বলে ওঠে—"ভালো করে ধরিস্, নইলে পড়ে যাবি।"

তারপর মুরোদপুরের জলার অভিযান। হাওয়ায় চুলগুলো উড়ছে, দীনুর চোখে দিবাকরের সাইকেল যেন পাখাওয়ালা পক্ষীরাজ, স্বর্গের পুষ্পক রথ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গলের প্রান্ত দেশে এসে পেঁৗছায় এই দীননাথ। আজকের আসামী ছুচোখ ভরে যে সব গাছপালা, বন-জঙ্গল নালা-ডোবা দেখলো তা বুঝি আর জীবনে দেখে নি। তারপর পাখির ঝাঁক, কালো, শাদা, বাদামী, লাল-কালো কালো-শাদার

দল। কি তাদের নাম, কোথায় থাকে, কি খায় সবই দিবাকর জানে।

দিবাকর সব জানে, হঠাৎ আঙুল দেখিয়ে বলে উঠে—"ওই যে রকপাখী।"

কোথায় কি, উড়ে গেল বটে, কিন্তু শুধু একটা ছায়া দেখা যায়।

দীননাথের হাত দুটি দিবাকরের কাঁধে, দুর্বল দীনু শক্তিমান দিবাকরের সান্নিধ্য পেয়েছে, আশ্রয় মিলেছে তার। এখন আর ভয় নেই। দিবাকরও অতি বেগে প্যাডেল করে চল্‌ছে, সাইকেল ছুট্‌ছে।

দিবাকর আশ্বাস দিয়ে বলে—"এই যে এখনই আমরা পৌঁছাব। ভয় কি! একেবারে পাখিদেব অন্দর-মহলে তোকে নিয়ে যাব।"

আনন্দে দীননাথের বুকটা ফুলে ওঠে। কার্লাইলের 'হীরোজ' সে কোনোদিন পড়েনি, পড়বেও না আর এ জীবনে। কিন্তু মহাপুরুষের সংজ্ঞা জানার জন্য তার কোনো কিছু পড়ার প্রয়োজন নেই। দিবাকর সেই মহাপুরুষ। স্বর্গীয় জ্যোতি তার মাথায়, পৃথিবীর সব বড় মানুষের সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল। দিবাকরকে অবশ্য এই সব কথা বলার দুঃসাহস তার নেই, তবে সে তাকে ভালোবাসে, বীবপুরুষকে পূজা করার নামান্তর হ'ল ভালোবাসা।

এইখানে রাস্তাটা চড়াইএর পথে উঠেছে। আর একটু উঠলেই টিলা পাহাড়। তার নীচেই সীমাহীন সবুজ মাঠ। তার চার পাশে ঘন জঙ্গল, এই অন্ধকারেই লুকিয়ে আছে অসংখ্য পাখীর দল। আরো দূরে নদীর ক্ষীণ রেখা দেখা যায়। সেই বিচিত্র দেশে ওরা এসে পৌঁছেচে।

দিবাকর বলল—"ঐ যে জলাটা, এটাই হল 'রাণীর জাঙ্গাল', এর পাশ দিয়ে গেলেই আমরা মুরোদপুরের বাঁকে পৌঁছব।"

ওরা এবার নীচে নামছে,—গতিবেগ আরো দ্রুত। সেই সোনার দেশে এসে ওরা পৌঁছেচে।

দীননাথের মুখে তৃপ্তিভরা হাসি ফুটে ওঠে। কতদিনের কথা অথচ যেন কত কাছের, কত বিচিত্র, কত মধুর।

এই সময় কে একজন সেলের ভেতর এসে পড়েছে, হাতে তার ফল আর খাবার ভরা পাত্র। এই তার শেষ খাওয়া না কি! কি যেন বলল—কিন্তু কি যে বললো আর লোকটা যে কে তা বোঝা গেল না। অন্ততঃ দীননাথ যেন বুঝলো না। সব যেন কেমন ঝাপসা হয়ে এসেছে।

বিরাট গাছের ভীড়ে দিবাকরের পাশাপাশি চলেছে দীনু, ছোট্ট অসহায়, সরল গ্রাম্যশিশু, পাখীর ডিমে তার প্রচণ্ড লোভ। একটা বিরাট পাখি, প্রকাণ্ড ডানা, সুদীর্ঘ ঠোঁট, নদীর ধার থেকে পাখা নাড়া দিয়ে উড়ে পালালো।

দিবাকর গাছে উঠছে, পায়ে জুতো নেই, কোমরে এক গাছি দড়ি।

"উঠে আয় দীনু! ভয় কি?" এই বলে দিবাকর দড়ির একটা প্রান্ত দীননাথের দিকে ছুঁড়ে দেয়। দীনু সেই দড়ি ধরে ওপরে উঠলে পৃথিবীর আরো কত বিচিত্র সৌন্দর্য সে দেখবে। নানা রঙের কয়েকটি ডিম, পাখির বাসায় পাশাপাশি পড়ে আছে।

সেই কারাকক্ষ ছেড়ে কোথায় যেন সে এসেছে—এখানে আগে আর আসে নি। একটা গম্ভীর প্রকৃতির লোক ওর হাত দুটো বাঁধলো, তারপর অতি তাড়াতাড়ি ওর মুখটায় একখণ্ড কাপড় জড়িয়ে বেঁধে দেয়, অদূরে একদল লোক সার বেঁধে যেন দাঁড়িয়ে আছে। কি দেখছে ওরা? কেন এত ভীড়।

দিবাকর আবার ডাকছে—"এই দীনু উঠে পড়, ভয় কি!"

পাখীর সেই বাসাটায়, চারটে ডিম, লাল, নীল, সবুজ—কি বিচিত্র রঙ! দীননাথ ওপরে ওঠে—পাখির বাসা পেড়ে আনবে। পাখিগুলো যেন নড়ছে, যেন ডানা নাড়ছে,—গতিবেগ ক্রমশঃ বাড়ছে,...

তারপর সব মিলিয়ে গেল, দীননাথ আর কিছুই দেখতে পায় না, সব কেমন অন্ধকার হয়ে গেল।

কাঠ গোলাপ

সে বলেছিল— যদি কোনদিন দরকার হয়, মনে তোমার এতটুকু দ্বিধা রেখো না, আমাকে লিখলেই আমি চলে আসবো, যেখানেই থাকি ছুটে আসবো।

মেয়েটি মৃদুগলায় বলেছিল—দরকার আমার সব সময়েই হবে, সর্বদাই তোমাকে স্মরণ করবো, কিন্তু চিঠি দেব না, তুমিও আর এসো না।

তারপর সেই মেয়েটির বিয়ে হয়েছে।

এখনো বর্ষা নামেনি, আষাঢ় শুরু হয়েছে, বিচ্ছেদের এই চরম মুহূর্তেই মেয়েটি প্রকাশ করলো তার মনের কথা। মেয়েটি ভালো, সেই জন্যই তাকে এত ভালো লাগে। ভালো বলেই তার মনে সুখ নেই, বিবেকের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি নেই। তাই ওর সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা করতে হয়, মেনে নিতে হয়। আর অনুনয়ের প্রয়োজন নেই। তাই সে আর দেখা না করার সঙ্কল্প সেদিন গ্রহণ করেছিল।

সাতই পৌষ মেয়েটির জন্মদিন, সেই দিনটিতে কিন্তু কিছু ফুল সে পাঠায়। কোনো চিঠিপত্র নয়, কোনো সংকেত নয়। শুধু কয়েকটি লাল গোলাপ। নিতান্তই রোমান্টিক খেয়াল, কিন্তু জানা ছিল লাল গোলাপ মেয়েটির প্রিয়, লাল রঙ হৃদয়ের রঙ। কোনো আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, বৎসরান্তে একবার নীরব নিবেদন। মেয়েটি নিশ্চয়ই জানে এ ফুল কার উপহার, কার মনের খবর বয়ে এনেছে এই নিঃশব্দ দূত। মেয়েটি বুঝবে মনে ভেবেই ছেলেটির বেদনা লঘু হয়। এ কি অভিব্যক্তিহীন আনন্দ। বিদায়ের দিনে মেয়েটির মুখে যে অব্যক্ত বাণীর সন্ধান পেয়ে মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল, এ সেই আনন্দ।

এই ফুলই ওর প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি। এই ফুলই কালিদাসের মেঘের মত প্রিয়ার কাছে না বলা বাণীর আকুলতা পৌঁছে দেবে।

দ্বিতীয় বছর এইভাবেই ফুল পাঠিয়েছিল প্রণবেশ।

এবার আবেগ অনেক মন্দীভূত, সে উত্তেজনা আর মনে নেই, তবু তার মনে মনে আনন্দ ছিল। ললিতা জানবে প্রণবেশ এখনো তাকে ভোলেনি। প্রণবেশ নিষ্ঠা আর আবেগের পরিচয় দিয়েছে। এ এক নিঃশব্দ স্মারক! এই পৃথিবীর অন্যত্র আর একটি প্রাণীর মনে জ্বলছে প্রেমের অনির্বাণ আলো।

তারপর তৃতীয় বছর, অনেক চিন্তার পর এইবারও ফুল পাঠালো প্রণবেশ। এতটুকু আবেগ, উচ্ছ্বাস বা উত্তাপ আর মনে নেই। শুধু আছে সামান্য অনুকম্পা। ফুল না যদি যথাসময়ে পৌঁছায় ললিতা হয়ত হতাশ হবে। হয়ত তার মনে হবে প্রণবেশ এতদিনে তাকে ভুলেছে। তাই শেষ মুহূর্তে ফুল পাঠাতে হ'ল।

এইভাবে সাতই পৌষ ফুল পাঠানোটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে একটা নিষ্প্রাণ সৌজন্য মাত্র। একদা যা নিষ্ঠা এবং আকুলতায় অভিষিক্ত ছিল আজ তা মধুর মিথ্যা। সেন্‌টিমেণ্টাল দুর্বলচিত্ত মানুষের নিছক ভদ্রতা। হয়ত আশা, আনন্দ ও উৎকণ্ঠায় এই দিনটির প্রতীক্ষা করে ললিতা, তার মনে আঘাত করা নিতান্ত অভদ্রতা। আর যাই হোক প্রণবেশ নির্মম নয়, তারও মনে অনুভূতি আছে। আর প্রতি বছর পৌষের প্রথম সপ্তাহে ললিতা আনন্দ বেদনায় স্মরণ করে যে একজনের নীরব ভালোবাসা আজো অম্লান। একটা নিদারুণ মিথ্যা তার মনে মধুর স্মৃতি নিয়ে জেগে ওঠে।

পাঁচ বছর পরে আবার যখন দু'জনের দেখা হ'ল, সাতই পৌষ অতিক্রান্ত হয়েছে তার দুদিন আগে। প্রণবেশ যথারীতি আগের

ঠিকানায় এ বছরও গোলাপ ফুল পাঠিয়েছে। কয়েকটি লাল গোলাপ।

এসপ্ল্যানেডের মোড়ে পুলিশের নির্দেশে পূব দিককার ফুটপাতের জনতা থেমে আছে। অন্যমনস্ক প্রণবেশ শূন্য মনে মোটর গাড়ির মিছিল দেখছে। সহসা অতি পরিচিত কণ্ঠে কে পিছন থেকে বলে উঠল—প্র ণ বে শ!

মুখ ফিরিয়ে পিছনে তাকাতেই দেখা গেল, ললিতা। সেই সেদিনের চেহারা আর নেই, মুখে নেই সেই লাবণ্য, দেহে নেই শ্রী। এই ক'টা বছরের মধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন! এখনও ললিতা তরুণী, বয়স ত্রিশের সীমান্তে, কিন্তু তার মুখের হাসিতে নেই মাধুরী, চোখে নেই দীপ্তি। এই পাঁচ বছর ধরে প্রতিদিনই সে প্রণবেশকে স্মরণ করেছে। প্রণবেশ ওর মুখের পানে তাকাতেই ললিতার মনে পড়ল এই সেই প্রণবেশ। একদিন যে বলেছিল—'যেখানেই থাকি ছুটে আসবো।'

প্রেমের চাইতেও অনেক বেশী টেঁকে তার আবেগভরা স্মৃতি, সেদিন সেই কথাটুকু উচ্চারণ করতে প্রণবেশের কষ্ট হয়েছিল, যন্ত্রণায় সে আকুল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে জ্বালা সাময়িক, স্তিমিত হতেও বেশি সময় লাগেনি।

ললিতাই আবার কথা বলল—একি, তুমি যে এ সময়? তোমাকে দেখতে পাবো স্বপ্নেও ভাবিনি।

—কালই কিন্তু বোম্বাই যাচ্ছি।

—বেশ আছো!

—আর তুমি?

—আমরা আজকাল কলকাতাতেই বাসা নিয়েছি।

—সত্যি! দিল্লী একেবারে ত্যাগ? কতদিন এসেছ?

—পূজোর পর থেকেই আমরা এখানে আছি, এখনও ফ্লাট শিকার ক'রে বেড়াতে হচ্ছে, তেমন ভালো রকমের বাসা পাওয়া যায়নি।

—ও, তাই নাকি !

পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, শূন্য দৃষ্টি। দুজনেই জানে না অতঃপর কি কথা বলা উচিত। ললিতার বুকটা যেন ফেটে পড়বে, অতি তীব্র কম্পন। তার মনে আনন্দ জেগেছে কিন্তু সেই সঙ্গে মিশিয়ে আছে আতংক। বার বার মনে হয়েছে প্রণবেশকে চিঠি দেয়, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সাহসে কুলোয়নি। কিন্তু আজ সহসা এইভাবে দেখা হয়ে যাবে কে জানতো ? আবার প্রণবেশের চোখের পানে সোজাসুজি তাকালো ললিতা—বলল—আজকাল বাড়ি পাওয়া দায়, কলকাতাটা কি হয়েছে ?

—কোথায় আছো তোমরা আজকাল ?

—ডোভার লেনে, সরকারী কোআর্টারে। জানাশোনা ভদ্রলোক, একখানি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। তাতেই কোনো রকমে আছি।

—কোথায় দিল্লী কোথায় ডোভার লেন, কেমন লাগছে ? দিল্লীতে তোমাদের বাড়িটা কিন্তু চমৎকার ছিল।

—হ্যাঁ ভালোই ত' ছিল, শ্বশুর রিটায়ার করেছেন, ওঁর চাকরী নেই। তাই চলে এলেন। ভাবলেন কলকাতায় এলে একটা কিছু ব্যবস্থা হবে। দিল্লী অবশ্য এখনও কলকাতার চেয়ে সস্তা, দুধ, মাছ সবই সস্তা, কিন্তু সেখানে কাজকর্ম পাওয়া কঠিন।

প্রণবেশ সংক্ষেপে জবাব দেয়—তা ত' বটেই—

—একটা চেষ্টা হচ্ছে কৃষ্ণভামিনী কটন মিলে, যদি জুটে যায় ত' ভালোই হয়, ওঁর এক বন্ধু সাহায্য করেছেন।

এতদিন পরে দেখা হয়েছে, সুখ-দুঃখের কথা সবই মন খুলে বলছে ললিতা। আবার বলল—কাজটা পেলে ভালোই হয়।

—হয়ে যাবে। ভালো সুপারিশে সব হয়।

—হ্যাঁ, তা বটে ! আমার কথাই ত' বলছি, তোমার খবর কি ? কেমন আছো ! কাগজ পত্রে প্রায়ই অবশ্য নাম দেখি,—তোমার একটা নভেল নাকি খুব চালু হয়েচে, সিনেমা হবে বলে কাগজে লিখেচে।

—যাঃ—তাই নাকি। কেন?

—হ্যাঁ, ভালো আর মন্দ, এদেশে সিনেমায় যদি বই চালু হয় তবেই লেখক জাতে ওঠে! নইলে কেউ তেমন পড়েও না।

—আর কেন! এই আমার দেশ। তাই লোকে যা চায় তাই লিখছি, সিনেমার ফরমাস খাটছি। সিনেমার কাজেই বোম্বাই যাবো। কি করবো বাঁচতে ত' হবে! ওরা মোটা টাকা দেয়।

—তা বটে, কিন্তু প্রণবেশ, তোমার মত একজন লেখকেরও এই অবস্থা। তোমাকেও লোকের মুখ চেয়ে কলম ধরতে হয়। যা ভাল বোঝ তা লেখা যায় না?

—হ্যাঁ,—কি করা যাবে! মন না চাইলেও অনেক কিছুই ত করতে হয়। আদর্শ আঁকড়ে বসে থাকলে অন্ন মিলবে না। কিন্তু এ-ভাবে পথে দাঁড়িয়ে কত কথা হবে, চলো না কোথাও বসে একটু চা বা কফি খাওয়া যাক।

—কিন্তু আমাকে যে কয়েকটা জিনিষ কিনতে হবে! এত কাজ!

—কাজ, জিনিষপত্র কিনবে সে ত' খরচের ব্যাপার, কাজ কি?

—কাজ, অর্থোপার্জন করতে হয়। সাবিত্রী শিক্ষামন্দিরের দিদিমণি অর্থাৎ হেডমিস্ট্রেস। স্পোর্টস্ প্রাইজের জন্য কয়েকটা রেডিমেড কাপ আর মেডেল কিনতে হবে।

—তুমি! মাস্টারী করছ! ভালো। এসো আগে কোথাও বসা যাক তার পর কথা হবে।

কফি হাউসের পক্ষেও সময়টা অসময়, অর্থাৎ তখনও তেমন ভীড় জমেনি, চারিদিকে শূন্য টেবিল। চেআর টেনে বসতে গিয়ে প্রণবেশ মনে মনে ভাবে এ কি বিচিত্র ফাঁকি! না পাওয়ার দুঃখ থেকে মনকে যখন আয়ত্তে আনা হয়েছে, যখন মন তৈরী হয়ে আছে অন্য পথে চলতে তখন অবাঞ্ছিতের মতো যা একদা পরম-রমণীয় মনে হয়েছে তা হাতের মুঠোয় এসে ধরা দেয়। কতদিন বিধাতার কাছে এমন

একটা সুযোগের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছে। প্রথম ছ'টি মাস কি যন্ত্রণায় না কেটেছে। আর এখন কফি হাউসে তার সামনেই বসে আছে প্রণবেশ উদ্বেগহীন, আকুলতাহীন। বরং অন্য টেবলে বসা মেয়েটির সাড়িটাই বার বার দেখার লোভ হচ্ছে। এই মুহূর্তে প্রণবেশ বুঝেছে ক' বছর ধরে কি আত্মবঞ্চনাই না করেছে, কিন্তু এখনও সেই ভাবেই থাকা ভালো, গাধামি করেছি বলার চাইতে গাধা হয়ে থাকা বরং ভালো।

—অনেকদিন পরে আবার আমরা এইভাবে বসেছি ললিতা।

ললিতা অতি ধীরভাবে জবাব দেয়—হ্যাঁ, তা বটে!

—কি যেন বলবে বলছিলে?

—আমি ত' সব কিছুই এক নিঃশ্বাসে বলে শেষ করেছি। তুমি এতদিন কি করছিলে বলো!

—কোনো রকমে দিন কাটিয়েছি।

—কাজকর্ম কিছু করছ, না শুধু লেখাপড়া!

—কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় একটা ছোট বই-এর দোকান করেছি। তেমন কিছু নয়, আর লিখছি। কিন্তু তুমি মাস্টারি শুরু করলে কবে?

—বিয়ের পর বি টি. পরীক্ষাটা পাশ করে রেখেছিলাম, ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হবে। এখন কাজে লেগে গেছে। তবে জানোই ত' মাস্টারি করার হাঙ্গামা কত!

—তা জানি, কিন্তু মাইনে পত্র ভালো দেয়?

—কোনো রকম, নতুন স্কুল, জনশিক্ষার চাইতে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়ানোই কর্তৃপক্ষের একমাত্র নেশা। কিন্তু মিছামিছি তোমাকে এত শত বলার মানে হয় না।

—না, না, বেশ ইন্‌টারেষ্টিং মনে হচ্ছে।

—দেখো, মোটামুটি একরকম ভালোই হয়েছে। তুমি ত' সব জানোনা, আমার শ্বশুরবাড়ির কেউ আমাদের বিয়েটা সুনজরে দেখেন

না। তাঁদের ধারণা আমাকে বিয়ে করে ওঁর এই দুরবস্থা। ওঁর গলায় আমি ভারি পাথর হয়ে ঝুলছি, মণিহার নয়। আর ওঁকে কিছু না বলে যা বলার আমাকেই বলে। সব দোষই ত' বৌ-এর। বৌ-এর কপালে হয়নি বলে আক্ষেপ। উনি অসুস্থ হলেন বৌ-এর দোষ। উনি কাজ করতে চান না বৌ-এর দোষ। এখানে চলে এসে অন্ততঃ একটু স্বস্তিতে আছি, দিনরাত কথা শুনতে হয়না। যারা ভালোবাসেনা তাদের সঙ্গে সুখে থাকার চাইতে এইভাবে কষ্ট ক'রে থাকা অনেক ভালো।

—তাই ত' ললিতা আমি আর এসব খবর কি ক'রে জানবো !

—অবশ্য তেমন বেশী কিছু কষ্ট নয়, তবে একরকম আছি। কাজ করছি তার জন্য মনে আনন্দ আছে, সংসার চলছে কোনো রকমে। আর ওখানে থাকতে কেবল শুনতাম এমন হঠাৎ বিয়েটা না করলে ওঁর কি ভালোই না হ'ত ইত্যাদি।

প্রণবেশ সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই-এর কাঠিটা এ্যাস্‌ট্রেতে গুঁজে বলে—ওদের কথায় তুমি কিছু মনে কোরো না, ওরা সবই ঐ রকম।

—এখন দেখ ঘর সংসার সব ক'রে আবার স্কুল চালাচ্ছি। চলে যাচ্ছে। একটু বেশী খাটুনি এই যা। আচ্ছা আমার কি খুব পরিবর্তন হয়েছে ?

সাহসী প্রণবেশ বলে ওঠে—না, না, এমন আর কি ! তবে কি জানো তোমাকে যে এত কষ্ট পেতে হবে তা আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। সারা দিল্লীতে তোমার মত হাসিখুসি মাখা মেয়ে অতি কমই ছিল। কিন্তু এই ত জীবন !

—এখানে আর শ্বশুরবাড়ির কেউ নেই, পথে ঘাটে কারো সঙ্গে দেখাও হয় না, বিরাট সমুদ্র, কে কার ! তাছাড়া পাঁচ বছরে মনেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আমার মনে হয়—'

তারপর সহসা থেমে ললিতা বলে ওঠে—ছিঃ ছি, কি যে আমার

হয়েছে, তোমাকে এত কথা বলে ফেললাম, মাঝে মাঝে খেয়াল থাকে না কোথায় কি বলছি।

—আরো কেউ কথা বলার আছে তোমার? অবশ্য শিবতোষ ছাড়া।

অতি ধীর গলায় ললিতা স্বীকার করলো—না, আর কেউই নেই, তা ছাড়া উনি দিনরাত চিন্তায় মগ্ন। কি জানো আমার বিশ্বাস ওঁর ধারণা আমাকে বিয়ে করেই ওঁর যত কষ্ট, ওঁর বাড়ির লোকেরা এই ধারণাটা ওঁর মনেও বদ্ধমূল করে দিয়েছে।

—তাহলে কি!

চুপ ক'রে রইল ললিতা। চামচটা অকারণে টেবলে ঠুকতে থাকে, তারপর শুকনো গলায় প্রশ্ন করে—কিসের কি?

—না, সত্যি তোমার জন্য দুঃখ হয় ললিতা। তোমার জীবনটা এমনভাবে নষ্ট হবে আমি কোনোদিন ভাবিনি।

—কিন্তু এ কি আমার দোষ। আমি ওর কি করেছি? আমার কি এতটুকু আত্মত্যাগ নেই। বিয়ে ক'রে আমারই কি চার হাত বেরিয়েছে। এখন আমি বুঝি—

গম্ভীর গলায় প্রণবেশ বলে—হয়ত, আমাকে এসব কথা তোমার জানোনো উচিত ছিল ললিতা, অনেক আগেই আমাকে বলা উচিত ছিল। সোজা আমার কাছে চলে আসোনি কেন?

প্রণবেশের মুখ দিয়ে কথাগুলি বেরিয়ে গেল, এই কথা বলার ইচ্ছা তার ছিল না, কিন্তু কি আর বলবে।

—আমি ভালো হয়ে থাকার চেষ্টা করেছি, তোমাকে ভুলেছি, ভুলতে পেরেছি বলেই কখনো একটা চিঠিও দিইনি। কিন্তু তুমি তো আমাকে ভোলোনি প্রণবেশ। প্রতি বছর ফুল পাঠিয়েছ নিয়ম ক'রে। কেন? কেন আমাকে ভুলে যাওনি?

—ফুল নিয়ে কি কোনো কথা হয়েছে? তুমি বিরক্ত হয়েছ নাকি?

—না, কথা উঠেছিল, আমি বলেছি আমার এক বান্ধবী পাঠায়, কলেজে সখী পাতিয়েছিলাম। কিন্তু ফুল আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

—ভালো, আনন্দ হ'ল ললিতা। এ বারেও তোমার দিল্লীর ঠিকানায় ফুল পাঠাতে বলে দিয়েছি। এতদিনে গেছে নিশ্চয়ই।

—তাই নাকি? পাঠিয়েছ! আমিও তাই ভাবছিলাম, তুমি নিশ্চয়ই ফুল পাঠাবে। শুধু এই একটা কারণেই জন্মদিনের মুখ চেয়ে বসে থাকতাম। কি বিশ্রী কন্‌ফেশন! মেয়েমানুষ জন্মদিনের জন্য আকুল হয়ে আছে। তোমাকে যে আর কখনো দেখবো তা ভাবিনি। মনে মনে শপথ করেছিলাম যেন আর দেখা না হয়।

—অথচ প্রাণ চাইত, প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়, কেমন তাই নয়?

পেয়ালায় এখনও আধ কাপ কফি রয়েছে, ললিতার সেদিকে খেয়াল নেই, সে চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ল।

—কি চুপ ক'রে রইলে যে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেও আমার কাছে আসার কথা মনে পড়েনি, ললিতা?

অতি কষ্টে ললিতা বলে—সে কথা থাক প্রণবেশ! আর আমি পারি না!

—কি পারো না? কি হ'ল তোমার ললিতা?

—সব কিছুই আর সয়না—জীবন আমার কাছে বিষ হয়ে উঠেছে, আমি অতি ক্লান্ত।

—তাহলে জীবনে বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। এরই মাঝে ক্লান্ত হ'লে কি চলে ললিতা, জীবন অনেক বড়ো। কাল চলো আমার সঙ্গে।

কোনো কথা বলে না ললিতা, মনে যে একটা দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে। এই দীর্ঘ বিরতিতে বিস্মৃত হয় প্রণবেশ, মনে মনে অনুতপ্ত হয়, হঠাৎ এভাবে কথাটা উচ্চারণ না করিলেই হত। ইতিমধ্যে বেয়ারাটা এসে জেনে গেল আর কিছু দিতে হবে কি না। তারপর বিলটা প্লেটে রেখে

বাকী পয়সা ফেরৎ দিল। প্রণবেশ চার আনা পয়সা প্লেটে রেখে বাকীটা নিয়ে ব্যাগে রাখল। ঘড়িতে একটা বাজে। ক্রমে ভীড় বাড়ছে। আশপাশের অফিস থেকে টিফিনের সময় কাটাতে এক একটি দল আসছে।

—তুমি কি তাই চাও প্রণবেশ!

প্রণবেশ কি আর বলবে, নিষ্প্রাণ কণ্ঠে—কি যে চাই ললিতা, সে কি তুমি জানো না?

হঠাৎ বলে বসল ললিতা—বেশ তাই যাবো চলো দুজনে বেরিয়ে পড়ি।

এই উত্তর আশা করেনি প্রণবেশ। পাঁচ বছর আগে যে জবাব পাওয়া উচিত ছিল পাঁচ বছর পরে সে জবাবের কি মূল্য আছে! এই অবস্থার ফলে যে স্ক্যাণ্ডাল শুরু হবে তার ক্ষতিপূরণ হবে কিসে। দিন, সপ্তাহ, মাস বা একটি পরম মুহূর্তের বিনিময়ে কি এতখানি কলঙ্কের বোঝা সইতে পারবে প্রণবেশ।

উভয়ে উঠে দাঁড়াল, নীরবে ললিতার পিছনে চলে প্রণবেশ, অনেক ভেবে অবশেষে বলল—এতদিনে তোমার কথায় খুসী হলাম।

ললিতা বলল—আমার মনের ভার অনেক লঘু হয়ে গেছে প্রণবেশ।

প্রণবেশ বলে—একটা ট্যাক্সী নেওয়া যাক্, কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে যাবে, না বাড়ি ফিরবে?

ললিতা বলল—বাড়ি ফেরাই ভালো, তুমি বরং আমার সঙ্গে একটু চলো।

ট্যাক্সীতে বসে প্রণবেশই প্রথম বলল—সকালে বেরোত পারবে? সকালে নাগপুর এক্সপ্রেসে খড়্গাপুর যাবো, ওখানে একটা কাজ সেরে রাতে বম্বে মেল ধরবো। কালই পারবে? না দু-একদিন পেছিয়ে দেব?

—না কালই যাবো, উনি ফিরবেন পরশু।

—কোথা থেকে ফিরবেন ?

—মুর্শিদাবাদ গেছেন, সেই কাপড়ের মিলের ব্যাপারে ? ট্রেনটা ক'টায় ?

—সাড়ে আটটা। পারবে ত' ?

—তাহলে হাওড়ায় দেখা হবে।

—হ্যাঁ, ফার্স্ট ক্লাস ওএটিং রুমে, আটটার ভেতর !

—প্রণবেশ, এক ঘণ্টা আগেও আমাদের দেখা হয়নি, আর এখন নতুন জীবনে শুধু তুমি আর আমি।

ললিতার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। করুণা জাগে প্রণবেশের মনে। সান্ত্বনা দেয় ললিতাকে—ছিঃ চোখের জল ফেলতে নেই। জীবন এমনই বিচিত্র বস্তু। কোনো কিছুই এখানে কায়েমী-স্বত্ব নিয়ে বসে নেই। সবই ছুটে চলেছে।

মনে মনে ভাবছে প্রণবেশ এ যেন অন্তবিহীন পথ। আরো দ্রুত চলা উচিত ট্যাক্‌সিটার। না একটা সিগারেট ধরানো যাক্। কি বিচিত্র কাণ্ড সে ক'রে বসল। একেই বলে হঠকারিতা। ললিতার হাত দুটি প্রণবেশের হাতের মুঠোয় তখনো ধরা রয়েছে, সে হাত বরফের মত ঠাণ্ডা, যেন সাপের গায়ে হাত দিয়ে আছে প্রণবেশ। কোথায় গেল সে উষ্ণ আবেশ, সবই কেমন যেন স্বাদহীন, বর্ণহীন।

অথচ পাঁচ বছর আগে, কি না হতে পারতো, কথাটা ভাবতেও গলা শুকিয়ে আসছে প্রণবেশের। জীবনটা সত্যই কি নিষ্ঠুর, কি বিশ্রী ! পাঁচ বছর আগেকার আষাঢ় মাস আর তার পরবর্তী পাঁচটি মাস কি অসহনীয় যন্ত্রণায় না কেটেছে প্রণবেশের। এবার শুধু ললিতাকে দেখার জন্য সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। আর আজ, সর্ব-প্রথম ললিতাকে সে চুমা খাওয়ার সুযোগ পেল, কিন্তু সে চুম্বন নিছক কর্তব্যের চুম্বন। তাতে না আছে আবেগ, না আছে অনুরাগ, না আছে উত্তাপ।

সন্ধ্যায় আবার এসে কফি হাউসে বসেছে প্রণবেশ। একটা সুতীব্র আলোড়নে তার হৃদয় মথিত। অথচ পরামর্শ করার কেউ নেই। পরামর্শ দেওয়ার কেউ নেই।

হঠাৎ পাশে এসে কে একজন বসল—কি প্রণবেশ বোম্বাই যাচ্ছ শুনলাম! বেশ আছো তোমরা।

লোকটি একটি নামকরা কলেজের নামজাদা অধ্যাপক। অর্থাৎ অনেকগুলি স্কুল-কলেজ পাঠ্য গ্রন্থের লেখক এবং বাংলা সাহিত্যের কড়া সমালোচক। গল্প উপন্যাস বেশী বিক্রী হয় বলে গল্প-উপন্যাসের প্রতি বিরূপ। প্রণবেশ লোকটিকে ভয় করে। সৌজন্যভরে শুধু বলল—একটা সিনেমা কোম্পানি ডেকেছে।

অধ্যাপক আরো গম্ভীর হলেন, বললেন—তার মানে আরো টাকা! কি যে হচ্ছে সব। দেখ প্রণবেশ দেশটা ধ্বংস হয়ে যাবে, এ আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। এই যেসব বই সিনেমা হয় আজকাল, আরে একেবারে যা তা, সেদিন পাশ পেয়ে কি একটা বই দেখলাম, কি তোমাকে বলবো, একেবারে দেখা যায়না—।

অথচ প্রণবেশ জানে বেশ আনন্দ করেই দেখেছেন অধ্যাপক, হয়ত একটা প্রশংসাপত্র লিখে দিয়েছেন। প্রণবেশ শুধু প্রশ্ন করল —মতামত দিতে হ'ল?

হবেনা,—ঐ জন্যেই ত' পাশ দিয়েছে। কি আর করি, লিখে' দিলাম দু'চার কথা। কেন কাগজে দেখোনি, বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে—

প্রণবেশ শুধু হাসল। অন্যসময় হলে সে তুমুল তর্ক শুরু করত, কিন্তু এখন ভয় করে, কি জানি প্রকাশিতব্য উপন্যাসটিকে বধ করে বিরাট প্রবন্ধ লিখতে ভদ্রলোকের বাধবে না।

ওদিকে 'মায়াবতী' পত্রিকায় সম্পাদক মহেন্দ্র সমাদ্দার চুরুট মুখে বসে আছেন, কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলেকে কি উপদেশ দিচ্ছেন। প্রণবেশ ওঁকেও ভয় করে। কলমে ভীষণ বিষ। প্রণবেশের নতুন

উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে ওঁর কাগজেই ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে। সাহিত্য সমাজে দারুণ প্রতিষ্ঠা, ওঁর অনুরাগ বা বিরাগের অর্থ অনেকখানি।

বললেই হ'ল—এই সব কেলেঙ্কারির পর আপনার উপন্যাস ছাপলে আমার গ্রাহক কমে যাবে।

ব্যাস, অমনি পাঁচশো টাকা বরবাদ, সেই সঙ্গে লেখক হিসাবে প্রণবেশের প্রতিপত্তি সবই জলে যাবে।

ছি, ছি, আজ দুপুরে এস্‌প্লানেড না গেলেই হ'ত। কাছাকাছি একটা দোকান থেকে চুরুট কেনে প্রণবেশ, আজো সেই উদ্দেশ্যেই গিয়েছিল। কিন্তু ললিতা যে অমন হঠাৎ এসে আক্রমণ করবে কে জানতো।

শুধু আক্রমণ, যেন ওকেই খুঁজছিল। প্রণবেশ মূর্খ, সেন্টিমেণ্টাল ফুল, অমন একটা থার্ড রেট মেয়েকে হিরোইনের মর্যাদা দেওয়া তার উচিত হয়নি। যদি ও না যায় হাওড়া স্টেশনে তাহলে কেমন হয়, ললিতা ত' ঠিকানা জানে না। কিন্তু কলকাতা শহরের যে কোনও সাময়িক পত্রিকা অফিসে ওর ঠিকানা আছে। খুঁজে নেওয়া শক্ত নয়।

না, আর এক কাপ কফি নেওয়া যাক, মাথায় কিছু আসছেনা। ললিতাব আর কি, ছেলে নেই পুলে নেই, শুধু স্বামী ত্যাগ, তা সে যা স্বামী স্ত্রী যদি চলে যায় সে মুক্তি পায়। আর প্রণবেশ চৌধুরী সেই বাসি ফুলের মালা গলায় পরে ফাঁসীর মঞ্চে উঠতে চায়। না কি বিশ্রী কাণ্ড সে করেছে। চুরুটটা আজ না কিনলেও চলত, এই জন্য লোকে বলে নেশার দাস হওয়া ভালো নয়।

অস্থির চিত্তে কফি হাউস থেকে উঠে পড়ে প্রণবেশ।

বাসায় ফিরে প্রণবেশ আশা করছিল চাকরটা বলবে কেউ অপেক্ষা করছে, কিন্তু কেউ কিছুই বললো না।

রাতের মধ্যেই স্যুটকেস আর হোল্ডঅল গুছিয়ে রাখলে প্রণবেশ।

এত রাতে কে আবার কড়া নাড়ল, 'সংকল্প' সাপ্তাহিকের সম্পাদক। কোন প্রয়োজন নেই, নিছক ভদ্রতার খাতিরে এসেছেন। ওঠার নাম নেই, অতঃপর চায়ের কথা বলতে হয়, আপত্তি নেই, এবং শেষ পর্যন্ত সেই ঈর্ষা—গল্পলেখকরা কি মজায় আছে। কেমন বম্বে চলেছে প্রণবেশ।

প্রণবেশ মনে মনে ভাবে—ঐ লোকটি সমস্ত প্রকাশকের দোকানে গিয়ে বলে আসবে, আমার সামনে স্যুটকেস বেঁধেছে মশাই, তখন কি জানি পেটে পেটে এত!

অবশেষে 'সংকল্প' সম্পাদকও বিদায় হলেন। বললেন—ভায়ার আজ মনটা তেমন যুৎ নেই দেখছি। আড্ডাটা তেমন জমলো না।

অন্য কোথাও জমাবার তালে তিনি উঠে পড়লেন।

অসহিষ্ণু প্রণবেশ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে আটটা না বাজতেই হাওড়া স্টেশনে এসে বসে আছে। কেউ দরজা খুললেই লক্ষ্য করছে, যদি ললিতা সংবাদ পাঠায় যাওয়া হলনা। তাহলে সে সোজা কালিঘাটে গিয়ে পূজো দিয়ে বাসায় ফিরবে। না হয় প্লেনে বম্বে যাবে।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই এসে হাজির হল ললিতা। বলল—বড্ড দেরী হবে গেল, না? ট্রেন ত' আটটা পঁয়ত্রিশে?

—না, এখন ত' আটটা কুড়ি, তবে ভয় হচ্ছিল, কি জানি, হয়ত মতটা বদলাল। টিকেট কেনা হয়ে গেছে, তোমার মালপত্র কই?

—বাইরে কুলীটা বসে আছে।

—তাহলে চলো যাই, তোমার তেমন জানা নেই, হাওড়া স্টেশনের কুলীর অনেক গুণ।

প্লাটফরমের ভীড়ে আর কোলাহলে বেশী কথা হয়নি। প্রণবেশ শুধু বলেছিল—কেমন ম্লান দেখাচ্ছে তোমাকে—

ললিতা জবাব না দিয়ে শুধু বলেছিল—এই তোমার মালপত্র!

কথা হ'ল গাড়িতে। প্রণবেশ বলল—তারপর ললিতা!

—বলো—

—এখন মনে হয় এ যেন সত্যি নয়।

প্রণবেশের কণ্ঠস্বর প্রাণহীন, নিতান্ত যান্ত্রিক।

ললিতা শুধু বলে—তাই নাকি!

—কেন? তোমার কি মনে হয়?

—আমার মনে হয় এর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই।

—কিন্তু তোমাকে এত মলিন দেখাচ্ছে কেন? রাতে কি ঘুমোওনি?

—তেমন নয়, এই অবস্থায় যেমন হওয়া সম্ভব। ভাবছিলাম।—

—কি ভাবছিলে আবার?

— আমাব 'না' বলা উচিত ছিল কিনা ভাবছিলাম। আমি যদি না বলতাম কি হ'ত প্রণবেশ? বলো না?

—কি আব করতাম। পুরুষ মানুষকে আঘাত সইতে হয়। সহ্য করতাম। ললিতা উত্তর দেয় না,—সোজা ওব মুখেব পানে তাকিয়ে থাকে।

—আচ্ছা প্রণবেশ, আমাকে তোমার কি মনে হয়। এমনই একটা বাজে মেয়ে। কীচক বধ ক'রে ভীমের কি আক্ষেপ হয়েছিল জানো, 'স্বল্পাঘাতে মরিল কীচক'। অর্থাৎ বিলম্বিত লয় না হলে গান জমেনা। তুমি অনুরোধ করলে, আমিও বাজী হলাম। এ যেন কেমন হ'ল, না?

প্রণবেশ শুধু বলল—তোমার মত মেয়ে আমি দেখিনি ললিতা? তুমি কি বাজে মেয়ে।

—কিন্তু ঘটনাচক্রে কি দাঁড়ালো?

—প্রশ্নের উত্তর তুমিই দিয়েছ! ঘটনাচক্র! শিবতোষের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে যদি আমাদের দেখা হত তাহলে আজ অন্য ইতিহাস রচিত হত, নয় কি ললিতা?

কণ্ঠস্বরই যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না, সে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে— অবশ্য তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে। তোমার মতের বিরুদ্ধে আমি এতটুকু চলতে চাই না। ইচ্ছা করলে তুমি কলকাতায় ফিরে যেতে পারো। আমি বাধা দেব না। পরের গাড়িতে ফিরলে কেউ কিছু টেরও পাবে না।

—তুমি কি আমার ওপর রাগ করলে প্রণবেশ ?

—আমার কথা ভেবো না! আমি চাই তুমি সুখী হও। যেখানেই থাকো আনন্দে থাকো। ডোভার লেনে ফিরে গিয়ে দুঃখের ভেতর থেকেই আনন্দকণা খুঁজে নিতে হবে, সেই সহজ পথ, সেই তোমার জীবন।

সাড়ে চারটের মধ্যে ফিরতি ট্রেনে আবার হাওড়ায় ফিরে এল ললিতা। তারই আধ ঘণ্টার ভিতর ডোভার লেন। এ যেন আবার পুনর্জন্ম।

কি ভাবে কয়েকটা ঘণ্টা কেটে গেল।

বেশ শীত পড়েছে। স্টোভটা জ্বেলে চায়ের জল বসিয়ে দিল ললিতা, কি জানি শিবতোষ হয়ত সন্ধ্যার গাড়িতে ফিরে আসতে পারে।

চাকরটা একটা বড়ো খাম হাতে নিয়ে ঢুকলো। দুপুরে এসেছে, দিল্লী থেকে পাঠিয়েছে ছোট ননদ ইন্দিরা। ছোট্ট চিঠি, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি শুকনো গোলাপ।

ইন্দিরা লিখেছে, তোমার সেই কলেজের সখীর পাঠানো গোলাপ ফুলের একটি পাঠালাম, ৭ই পৌষ এসে পৌঁছেছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ললিতা, এই সেই লাল গোলাপ, আজ ক'বছর এই ফুলই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ফুল কটির জন্যই যেন সে বেঁচেছিল, অথচ আজ এই ফুল নিয়ে এসেছে এক মুক্তির আস্বাদ, মধুর মিথ্যার হাত থেকে এ এক নিষ্কৃতি।

কেট্‌লির জলটা ফুটে এসেছে।

প্রতিষ্ঠা

পালাম বিমান-ঘাঁটি পার হওয়ার কিছু পরেই এয়ার হস্‌টেস্‌ মনোহর ভঙ্গীতে হেসে চকোলেটপূর্ণ ট্রে সামনে ধরে দাঁড়াল। ডাঃ মজুমদার একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। লক্ষ্য পড়তেই বলে উঠলেন, থ্যাঙ্কস্‌, আমার কিছু চাই না।

ইতস্তত করে একটু সলজ্জ ভঙ্গীতে মেয়েটি বল্‌ল: কাল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আপনার ছবি দেখলাম নিউজ রীলে।

গম্ভীর গলায় ডাঃ মজুমদার শুধু বল্লেন—তাই নাকি! ধন্যবাদ।

সীটে অর্ধশায়িত ভঙ্গীতে চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলেন ডাঃ মজুমদার। রাষ্ট্রপতির ভবনে আজ সকালেও সম্বর্ধনা ছিল, এখনও যেন করতালির আওয়াজ কানে ভেসে আস্‌ছে। কিন্তু কি তার মূল্য? দ্রব্যটি এখনও তাঁর পকেটে রয়েছে, ভেতরের পকেটটা যেন ভারী হয়ে রয়েছে, ভেলভেটের কেসে সুন্দর একটি পদক। নিজের অজ্ঞাতসারেই ভিতরের পকেট থেকে কেসটি টেনে বার করে আর একবার দেখলেন ডাঃ মজুমদার। পাওয়ার পর থেকে এমন অনেকবারই দেখেন, আবার পকেটে রেখে দেন, এমনই চলেছে ক'দিন ধরে।

হোসটেস্‌ মেয়েটি আবার এসে দাঁড়িয়েছিল একবার: একটু উসখুস করে আবার চলে গেল। কিছু বলতে চায়, খ্যাতির এই বিপদ, পথে-ঘাটে চলা দায়। মেয়েটি একটু লাজুক, হয়ত ভয় পাচ্ছে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে। তবে এই মেয়েটি সুন্দরী, রঙটা এত ফরসা যে রক্তহীন মনে হয়, সুষমার কিন্তু রূপ ও রঙ দুই বেশ পাকা ছিল।

এতদিন পরে আবার সুষমার কথা মনে পড়ে গেল। তখন ডাঃ

মজুমদারের বয়স অনেক কম, মাত্র সাতাশ-আটাশ। কিন্তু জীবন সংগ্রামে তখনই তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। অর্থকষ্ট যে কি জিনিষ তা ডাঃ মজুমদার বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন। দিনের পর দিন কেটে গেছে, নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার দিন, বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় ঘটেছে। ডাঃ মজুমদার জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে সন্ন্যাস কিংবা আত্মহত্যা যা হয় কিছু একটা করার জন্য প্রায় মনটাকে রাজী করে এনেছিলেন। এমন সময় অসুখে পড়লেন।

অসুখ সার্‌লো, কিন্তু দুর্বলতা কাট্‌লো না, সকলের অনুরোধ সামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করে—হাওয়া বদলের জন্য পুরীতে এলেন।

এই পুরীতেই পাওয়া গেল সুষমাকে।

সন্ধ্যা হয় হয়, সমুদ্রের তীরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, এই অংশটায় ভীড়টাও অপেক্ষাকৃত কম, ডাঃ মজুমদার সমুদ্রের ঢেউ আর আকাশে মেঘের লীলা তন্ময় হয়ে দেখ্‌ছিলেন।

প্রথমে মনে হ'ল কে যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, পরে শুন্‌লেন, "এই সব দেখেই ভগবানের ওপর বিশ্বাস আসে।"

"কি সব ?" তিনি বেশ গম্ভীর হয়েই বলেছিলেন কথাটা।

"কেন সবটাই, এই আকাশ, বাতাস, সমুদ্রের রঙ সবই, কেন আপনার কি তা মনে হয় না ?"

"কি জানি, আমি অত সব ভাবিনি।" এইবার ডাঃ মজুমদার মেয়েটিকে বেশ ভালো করেই দেখলেন।

মেয়েটি কড়া প্রকৃতির, বেশ রূঢ় ভাবেই বল্ল—"দেখবেন কোথা থেকে ? আপনার মুখ দেখেই বুঝেছি চোখ নেই। নিজের কথা ভেবেই মসগুল হয়ে আছেন, ভগবানের কথা ভাব্‌বেন কখন !"—মেয়েটি আর দাঁড়াল না, প্রায় উড়ে চল্‌ল, কপালকুণ্ডলা প্যাটার্নের খোলাচুল পিঠের ওপর ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে, সেও যেন সাগর তরঙ্গ।

ডাঃ মজুমদারও পিছনে চল্‌লেন তেমনই দ্রুত পায়ে, কাছাকাছি

এসে বল্লেন—"মাফ্ করবেন, আমি আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্য ওসব কথা বলিনি। আমার মনটা তেমন ঠিক নেই।"

এই হ'ল পূর্ব রঙ্গ।

পরবর্তীকালে ডাঃ মজুমদার ভেবেছেন—জনতার ভিতর মেয়েটিকে কি তিনি আবিষ্কার করতে পারতেন? বোধহয় পারতেন না। তবে প্রথম থেকেই মেয়েটিকে মোহনীয় এবং মনোরম মনে হয়েছে। গলার আওয়াজটা ভালো লোগছিল, সেইটুকুই ত' সব। একটু অবশ্য খুঁত ছিল সুষমার, আর সেই খুঁতটুকুর জন্য গোড়ায় মন খুঁত খুঁত কবেছে, পরে তা সয়ে গেছে। ওপরের ঠেঁটের ওপর সেই শ্যামল বোমরেখা পীড়াদায়ক মনে হয়েছিল, কিন্তু গায়ের রঙ তাব এমনই যে খুঁতটুকু নজরে পড়্ত না, পরে সেকথা এক রকম ভূলেই গিয়েছিলেন ডাঃ মজুমদার।

পুরীতে দু সপ্তাহ কাট্লো। আর এই দু সপ্তাহে এই একটি তরুণী ডাঃ মজুমদারের মনে বেঁচে থাকার বাসনা প্রবল করে তুল্ল। যেন সারাদিনের মেঘভারাক্রান্ত আকাশে কয়েক মুহূর্তের জন্য সূর্যালোক প্রকাশ পেয়েছে।

সুষমার হাসি তাঁর মনে সেদিন এমনই সজীবতা ফুটিয়ে তু'লেছিল।

মাঝে মাঝে সুষমা কল্‌কাতার কথা তুল্‌তো, তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় গোষ্ঠী ও সংসারের কথা। কথা বল্‌ত খুব কম ও কদাচিৎ—কিন্তু যা বল্‌ত তা দিয়ে মনে মনে একটা পূর্ণাংগ ছবি রচনা কবা কঠিন হত না।

সুষমা হয়ত বল্‌ত, 'একজন নতুন কবি ছোড়দার কাছে আসেন. ভারী চমৎকার লেখেন' কিংবা 'চারু পাকড়াশীর ছবি কেমন লাগে, প্রায়ই আমাদের বাড়ি এসে ওঠেন।'

আরো কত ব্যক্তির কথা, সবাই যে তাঁরা খ্যাতিমান তা নয়, তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাই

তাঁদের নামাবলী সুষমার জপমালা। এই সব ভবিষ্যৎ মনীষীদের দিয়ে সে যেন তার সংগ্রহ মালা সাজিয়ে রেখেছে।

সুষমা বল্‌ত, "এই সবই ত' মানুষ, এদেরই যা কিছু মূল্য আছে সংসারে, বাদ বাকী সব কাটা সৈনিকের দলে, থাকলেই বা কি গেলেই বা কি।"

নিজের কথা—তাঁর আশা ও আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন সব কিছুই ক্রমে ক্রমে বলেছেন ডাঃ মজুমদার। বলেন নি শুধু তাঁর পরাজয় ও অসাফল্যের ইতিহাস।

সুষমা কিন্তু ঐটুকু শুনেই উৎসাহে লাফিয়ে উঠেছিল, "ওরে বাবা! এ সব কথা ভাবলেও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে,—আর দশবছর পরে তোমার যা অবস্থা হ'বে, কেউ তোমার কাছেই ঘেঁষতে পারবে না—এ আমি জানি, তুমি ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে।"

ডাঃ মজুমদার স্বপ্নাবিষ্টের মতো বলেছিলেন: "এ আমাকে করতেই হ'বে, এ আমার জীবনের ব্রত।" বলেই কিন্তু ভেবেছেন এতখানি না বললেও হ'ত।

সব ছুটির মত পুরীর সেই কটি দিন আর সমুদ্রতীরও ফুরিয়ে গেল, সুষমা ফির্‌ল কল্‌কাতায় আব ডাঃ মজুমদার সেণ্ট্রাল ক্লিনিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে এ্যাসিসষ্টাণ্টের কাজ নিয়ে দিল্লী। বিদায়ের সময় ডাঃ মজুমদার বলেছিলেন; "আমার যা মনে হচ্ছে সুষমা, বোধ করি তোমারও তাই হচ্ছে—?"

"হ্যাঁ, তা আমিও ভেবেছি।"

বিয়ের কথা ওঠায় বলেছিল সুষমা, "বিয়ে তোমাকেই হয়ত করব, তবে তার এখনও সময় হয়নি, এখনও তুমি মানুষ হওনি, ছেলেমানুষ আছো,—তুমি এখন যা—তার চাইতে তুমি পরে যা হবে তার উপরেই আমার ভালোবাসা।"

আরো কয়েকটি মাস কেটে গেলো। কাজ করেন ডাঃ মজুমদার; নিজের মুখ চেয়ে যত না হ'ক, সুষমার মুখ চেয়েই তাঁর কাজ।

নিয়মিত না হ'লেও মাঝে মাঝে পত্রালাপ চল্‌ত, তবে সে সব চিঠি নৈর্ব্যক্তিক। যেন তার মনের এক পাশে ডাঃ মজুমদারের কথা সযত্নে সরিয়ে রেখেছে সুষমা।

এমনই মনের অবস্থা, সুষমার জন্য আকুলতার আর অন্ত নেই, সেই সময় একদিন আকস্মিক দুর্ঘটনার মত জীবনে প্রথম সাফল্যের সূচনা দেখা গেল। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্ণালে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, সেই সংগে সংক্ষিপ্ত পবিচয়। এর কিছু পরেই অন্যত্র ছবি ও প্রবন্ধ একত্রে প্রকাশিত হ'ল। আমাদের দেশে তখনই প্রতিভার কদর হয় যখন তা বিদেশীর হাততালি পায়। ডাঃ মজুমদাব একটু স্বীকৃতি পেলেন ভারতীয় চিকিৎসক সমাজে।

তাঁর জীবনের যা সর্বপ্রধান কামনা অবশেষে তার দ্বার একটু করে যেন উন্মুক্ত হ'তে সুরু হ'ল। জীবন-সংগ্রামেব অবসান না ঘট্‌লেও বিরতির সময় আসন্ন বলে মনে হ'ল। এক বছর আগে হলে এই ঘটনায় তাঁব আনন্দের সীমা থাক্‌তো না, কিন্তু এখন আর তেমন যেন মূল্য নেই। তিনি জানতেন এ সবই তাঁব হ'বে, কিন্তু সুষমা যেন দূরে সরে যাচ্ছে,—এখনও উপযুক্ত অর্থ সঞ্চয় করতে অনেক বছর কেটে যাবে, নিরাপত্তাব আশ্বাস না দিতে পারলে সুষমাকে বিয়ে করার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

অবশেষে একদিন কল্‌কাতায় চলে এলেন ডাঃ মজুমদার। সুষমাদের বাড়ির অবস্থা যেমনটি আশা করা গিয়েছিল তেমন নয়। অর্থাৎ উপরে সাজ আছে, ভিতরটা ফাঁকা। কিন্তু ডাঃ মজুমদাবের চাইতেও সুষমাকে তারা অনেক কিছু দিতে পারে—তারাই সব কিছু দিয়ে সুষমাকে ঘিরে আছে। সেই পটভূমিব ওপর দাঁড়িয়ে সুষমা হাসছে, শান্ত ও মৃদু তার সেই হাসির ভঙ্গী।

সুষমার বাবা ও মা, পার্টি ও সোসাইটি, এই নিয়েই মেতে আছেন, আর সুষমা শুধু হাসে। ডাঃ মজুমদার অস্বস্তি বোধ করেন, কারণ এই সব সমাজের কিছুই তাঁর জানা নেই।

অবশেষে একদিন নিরিবিলিতে সুষমাকে ধরে কথাটা পেড়ে ফেল্লেন ডাঃ মজুমদার—"সুষমা, আমি একটা চাকরী পেয়েছি, মনে কর্‌ছি নিয়ে নেব।"

"কি চাকরী। ডাক্তারের আবার চাকরী কি ?"

"মেডিক্যাল অফিসর, রেলের চাকরী, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব। মাইনেও মন্দ নয়, তা ছাড়া ভালো কোয়ার্টার পাওয়া যাবে। উপস্থিত নাগপুরে যেতে হ'বে।"

ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সুষমা প্রশ্ন কর্‌ল ; "এসব কখন ঠিক হল !"

—মাস দুই আগে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, এখন শুনছি পাশ করেছি, চাকরীর খবর দিয়ে চিঠি এসেছে।"

"তারপর তোমার রিসার্চের কি অবস্থা হবে !"

"অবসর সময়ে কিছু কিছু কাজ করব"—তারপর সুষমাকে একরকম কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন—"চাকরীটা কেন নিচ্ছি জানো সুষমা ?"

"জানি।" সুষমার সংক্ষিপ্ত জবাব।

"তোমাকে বিয়ে করাটাই সব চেয়ে বড় কাজ, এখন সেটা সম্ভব হবে।"

"তুমি কি এখনই আমার জবাব চাও ?"

"তাড়া কিসের, আমি পরশু দিল্লী ফির্‌ব, তার আগে হ'লেই হবে ! একটু না হয় ভেবেই বোলো।"

এই দুদিনে সুষমা তাকে সর্বত্র নিয়ে গেল, যত আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধব ছিল সবায়ের কাছেই তার পরিচয় দিয়ে বেড়াল। তাঁরা সকলেই প্রায় সমপর্যায়ের প্রাণী। সাফল্য তাঁদের করায়ত্ত, অর্থের জন্য এতটুকু আকুলতা নেই।

নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার আড়ালে টাকার থলির ওপর বসে তাঁরা সবাই বললেন, "আপনার সাহস আছে, ধন্য আপনার ত্যাগ ও সাধনা। আদর্শ ছাড়্‌বেন না কখ্‌খনো ডাঃ মজুমদার।"

সুষমাই এখন তাঁর একমাত্র আদর্শ, জীবনের ধ্রুবতারা। সুষমার মুখের দিকে তাকালেন ডাঃ মজুমদার, উজ্জ্বল সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো চমৎকার একখানি ছবি। কিন্তু সুষমার জবাবটা জানতে সাহস হয় না।

সুষমাই অবশেষে বলে, 'দেখ তোমাব যা কল্পনা সেইটুকুই আমার কাছে সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তোমাব দুর্বলতা দেখে আমি হতাশ হয়ে গেছি, আমার জন্য তুমি আদর্শ ছেড়ে শেষে রেলের ডাক্তার হ'বে ?"

চাকরী নেওয়া আর হ'ল না। ডাঃ মজুবদার দিল্লীতে ফিরে গেলেন। সুষমা আর টেষ্টটিউব, এর মধ্যে শেষেরটি নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাক্‌তে হ'ল। বেলের চাকরী, বড় বাংলো, বিনা মাইনের চাকব-দাসী শূন্যে মিলিয়ে গেল।

লোকে তাঁর আদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠাব প্রশংসা করে, কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল এই প্রশংসার ? কি প্রয়োজন প্রাইজ পাওয়াব পর এই হাততালির। এ হাততালি তাঁব সাফল্যের সম্বর্ধনা না জীবন-সংগ্রামে চরম ব্যর্থতার পরিহাস ?

যান্ত্রিক গতিতে কাজ কবে গেছেন তিনি, সব কিছুর বিনিময়ে আজ সম্মান, অর্থ আর পকেটের এই ভেলভেট কেসে শায়িত সুবর্ণ পদক। কিন্তু—?

একটি মেজাজী মেয়ে একদা বলেছিল, 'না', তাবফলেই তাঁব জীবনধারা সেইদিনই অন্যপথে প্রবাহিত হয়ে গেছে।

ডাঃ মজুমদার লক্ষ্য কর্‌লেন—হস্‌টেস্‌টি আবার এদিকেই আস্‌ছে খালি হাত, বোধ হয় একটু অবসর মিলেছে এতক্ষণে। এই-বার তিনিই তাকে ডাক্‌লেন, পাশেব শূন্য আসনটিতে বস্‌তে ইঙ্গিত কর্‌লেন।

মেয়েটি সলজ্জ ভঙ্গীতে অতি সংকোচে তাঁর পাশটিতে বসে পড়ল, একবার আড় চোখে তাঁর কেশ বিরল প্রকাণ্ড মাথাটা লক্ষ্য কর্‌ল!

ভারতের প্রতিটি সংবাদপত্রে যাঁর ছবি, সেই ব্যক্তির পাশেই সে বসে আছে। ইউরোপ যাঁকে জয়মাল্য দিয়েছে, স্বদেশে যার সম্মানের সীমা নেই—সেই ডাক্তার মজুমদার!

মেয়েটি অনেক পরে বল্‌ল: "সারাজগতের কাছে আপনি আজ স্মরণীয়, সবাই আপনার জয়গান কর্‌ছে, আপনার এই প্রতিষ্ঠায় আমাদের আনন্দের আর সীমা নেই। আপনারও নিশ্চয়ই খুবই আনন্দ হচ্ছে?"

মেয়েটি কি বোকা? সব মেয়েই এমনি। কিন্তু প্রশ্নটা যে বড় কঠিন। ডাঃ মজুমদার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, সুষমার কথা আবার মনে পড়ল, কে জানে পুলিশ কোর্টের বড় উকীল শিবু চাটুয্যেকে বিয়ে করে কি ভাবে তার দিন কাটছে। প্রাইজের কথাও মনে হ'ল! আজকের দিনে কি প্রয়োজন তাঁর এই টাকায়? কি প্রয়োজন এই সুবর্ণ পদকের? কি প্রয়োজন এই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার? নগদ ত' কিছুই হাতে রইল না!

মৃদু গলায় ডাঃ মজুমদার বলেন, "সবটাই যেন ফাঁকা,—যা শূন্য এত পাওয়ার পর তা পূর্ণ হ'ল কই?"

কেন্দ্রবিন্দু

মেয়েটির সম্বন্ধে কোনো কিছু জানা ছিল না, নামটাও জানতাম না, তবু মনে একটা নামকরণ করেছিলাম—হাসিদি। এই নামেরও কোনো অর্থ ছিল না, হয়ত তার মুখের হাসি আমার ভালো লাগত। যখনকার কথা বল্‌ছি তখন তাঁর বয়স কুড়ি-একুশ আব আমি দশে পড়েছি। তার বেশী ত নয় কিছুতেই।

সেই সময়টা আমবা বেলেঘাটায় রাসমণি বাজারের কাছাকাছি থাকি, সকালে স্কুল যাওয়ার পথে হাসিদিকে দেখতাম। হয়ত তিনি কাছাকাছি কোন মেয়ে স্কুলে মাষ্টারি করতেন। কিন্তু পোষাকটা এত ভালো—যে তাঁকে ছেলেবয়েসে রাজকন্যা বলে মনে হ'ত। খুব যে আড়ম্বর ছিল সেই পোযাকে তা নয়, সাধাসিধের ওপর জৌলুষ ছিল অনেক বেশী। স্কুলের টিচার হলে আরো মানাতো, কে জানে! জানিনি কোনোদিন, জান্‌তেও পারিনি।

আগেই বলেছি পোষাকটা জম্‌কালো ছিল, কিন্তু বাহুল্য ছিল না, প্রতিদিন ধোপদুরস্ত সাড়ি নিখুঁত ভাবে পাট করে গুছিয়ে পরা থাক্‌তো,—সব বোঝবার বয়স নয়, তবু মনে হয় সেই বয়সে ভালো লাগার চোখ আমার ফুটেছিল। বেশ যত্ন নিয়ে কাপড়-চোপড় পরতেন এ কথা বলা চলে। দামী জিনিষ না হলেও বেশ সুনির্বাচিত সুরুচিসঙ্গত বেশবাস। রঙীন সাড়ির চেয়ে ধপধপে সাদা সাড়িতেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। গলায় পাতলা সরু হার, হাতে দু-চার গাছি সোনার চুড়ি। আর দু-একখানি বই-এর সঙ্গে ছোট একটা হ্যাণ্ড-ব্যাগ।

কিন্তু সব ছাড়িয়ে যে জিনিষটা স্মরণে আছে, সে হাসিদির কানের দুল, অতি চমৎকার। ও ধরণের জিনিষ আজকাল দেখা

যায় না, লাল-নীল পাথর বসানো মূল্যবান কানবালা,—আমরা অবশ্য তখন কানবালা আর দুলের তফাৎ জানি না, কানে যা পরা হয় তার নাম দুল, এই আমাদের ধারণা। দেখলে যদিও বহুমূল্য মনে হত, হয়ত আসলে ততখানি দাম তার নয়; তবু সেই দুল আমার মনে দোলা দিত। হাসিদির পোষাকের কেন্দ্রবিন্দু ওই দুল। ঐ দুলটাকে কেন্দ্র করেই তিনি সাজ করতেন। সব কিছু জ্যোতি ঐ দুলকে কেন্দ্র করেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত।

প্রতিদিন সকালে আমি বা দিকের পথ ধরে স্কুলে যাই, আর তিনি ডান দিকের গলিতে ঢুকে তাঁর কাজে যান। এইটুকু সম্পর্ক। কিন্তু আজ বুঝি হাসিদি তার তাঁর দুল আমাকে অভিভূত করেছিল। আমি ঠিক সময়ে মোড়ের মাথায় হাজির থাকতাম তাঁকে চোখ ভরে ভালো করে দেখার জন্য, তিনি হয়ত কোনোদিন আমাকে লক্ষ্যই করেন নি। সব কিছু তাঁর ঠিক ঠিক, ছিম্ ছাম্ জ্যামিতিক নির্ভুলতা। যেমন চোখ তেমন নাক। কোনদিন পোষাকের এতটুকু বাহুল্য দেখলাম না। যখন খুব গরম, রোদের তেজ বেশী তখনও মাথায় ছাতি নেই, সাড়ির প্রান্তদেশ কাঁধে ফেলা, একটা শাদা হাড়ের কিংবা রূপোর ব্রুচ কাঁধের কাছে আটা। আনন্দময়ী নারীমূর্তি। পথে চল্‌তে গান তিনি করেন না কোনোদিন, কেউই করে না। কিন্তু তাঁর চলার ভঙ্গীতে যেন একটা অপূব সুরলালিত্য, অপরূপ ছন্দসুষমা। কখনও তাঁর সঙ্গে দেখিনি কাউকে, শুধু সকালেই তাকে দেখতে পেতাম, বিকালে কোনোদিন নয়।

এমনই চলে, সকালের পব সকাল। কয়েক মাস চল্‌লো।

তারপর একদিন সকালে যখন গলির মোড়ে এসে পৌছেচেন, লক্ষ্য করলাম দুলটার একদিক খুলে গেছে, অল্প অংশ কানে লেগে আছে, কোনো রকমে ঝুলছে। বোঝা গেল তাড়াতাড়িতে ঠিকমত আঁটা হয়নি। হাসিদির কিন্তু এতটুকু ধারণা নেই যে দুলটা অমন

ঝুলছে। আমাকে ছাড়িয়ে দু-দশ পা যেতে না যেতেই দুলটা খুলে পথের ওপর পড়লো। তৎক্ষণাৎ আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সেটি কুড়িয়ে নিলাম। সেই ভাবেই দুলটি হাতে নিয়ে ওঁর দিকে এগিয়ে চলি, যাঁর জিনিষ তাঁর হাতে তুলে দিয়ে ধন্যবাদ পাব, এই আশা।

কিন্তু একটা অদৃশ্য শক্তি যেন আমার গতিরোধ করল—আমি কখন যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি বুঝিনি। হাসিদি দুলহীন কানে গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়েছেন।

কেন এমন করলাম? কোনদিন ত' পরের জিনিষে লোভ ছিল না, মেয়েদের গহনায় আমার কি প্রয়োজন? হাসিদির স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সেটা আমার সংগ্রহ করা উদ্দেশ্য ছিল না কোনোকালে। একটা পেনসিল, বা মাউথ অর্গান, ছুরি, মার্বেল বা ঘুড়িও নয়, তবু কেন নিলাম?

অংশতঃ আমার চক্ষুলজ্জা, উৎকট কুণ্ঠা।

কোনদিন তার সঙ্গে বাক্য বিনিময় হয়নি। দৃষ্টি বিনিময়ও নয়। যতদূর জানি আমার অস্তিত্ব তাঁর জানা ছিলনা। আমি অবশ্য আত্মসচেতন ছিলাম। মেয়েরা যখন পোষাক পাল্টায় তখন যেমন আমরা সচেতন হই, সচকিত হই, তেমনই আমার মনোভংগী।

তাই হয়েছিল। পোষাক পরিবর্তন। আব ত' হাসিদির পোষাক সম্পূর্ণ নয়। কেন্দ্রবিন্দু কক্ষচ্যুত। আমার আর কুণ্ঠা নেই, মনে জেগেছে কৌতুহল। গভীর কৌতূহল। মনে মনে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা এখন এই দুল হারিয়ে হাসিদির কি হবে? নিশ্চয়ই কত খুঁজবেন, কতবার ভাবনা হবে, মন খারাপ হবে।

পরদিন প্রভাতে কিন্তু নিজের ব্যবহারে আমি অতিশয় লজ্জা পেলাম। যথা সময়ে আবার সেই পথের-মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। হাতের মুঠিতে হাসিদির দুল। আজ আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই দুল তাঁকে ফেরৎ দেবই। যার জিনিষ তাঁর হাতে দিয়ে স্বস্তি অনুভব করব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলনা। হাসিদির আকৃতি এবং প্রকৃতিতে এই অল্প সময়ের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। সেই দেখতেই আমি এমন মগ্ন হয়ে রইলাম যে তিনি আমার কাছ ঘেঁষে চলে গেলেও আমি কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম, যখন চৈতন্য হল তখন দেখি তিনি অনেক দূরে চলে গেছেন।

এত শীঘ্র যে কারো এত পরিবর্তন ঘটে সে জ্ঞান আমার ছিলনা। অন্ততঃ আমার মনে হল আজ সকালে তাঁর পোষাকের সেই পরিপাট্য নেই, অন্ততঃ আমি তাই ভেবেছিলাম। ঠিক কোন অংশ এই পরিবর্তন ঘটেছে, কি যে এই পরিবর্তনের কারণ তা বুঝলাম না। সেই রকমই পালিশকরা জুতা, কাপড়, ব্লাউজ তেমনই ধোপদুরস্ত। তাহ'লে কি হল? আমার মনের ভুল? তাহলে কি হাতের হ্যাণ্ডব্যাগ, কিংবা মাথার খোঁপা? কানের দুল যেখানে দুল্‌তো সেই শূন্য অংশটাও দেখলাম। বুঝলাম না।

প্রতিজ্ঞা করলাম পরদিনই দুলটা ঠিক ফেরৎ দেব। কিন্তু দিলাম না। তার পর দিনও নয়। এমন কি তারপরও নয়। প্রতিদিনই দুলটা কিন্তু হাতে কিংবা পকেটে থাকে। এদিকে এক একটি দিন যায় আর আমার পক্ষে দুল ফেরৎ দেওয়া কঠিনতরো হয়ে ওঠে। পরে বুঝলাম আমার ধারণাই ঠিক, দুলটাই ওঁর সৌন্দর্য্যের হানি করছে। সাইকেলের চাকার হুইল যদি না থাকে তাহলে স্পোক্‌গুলি ঢিলে হয়ে খুলে পড়ে, ওঁর দুল হ'ল সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু, তাই সবকিছু কেমন শিথিল হয়ে পড়েছে।

প্রতিদিনই দেখি আগের দিনের চেয়ে আরো খারাপ দেখতে হচ্ছে হাসিদিকে, শাড়ির ভাঁজে তেমন কড়া ইস্ত্রি নেই, জুতোয় সে পালিশ নেই। ব্লাউজটাও কেমন ময়লা, দিনের পর দিন, সপ্তাহ যেন সাধারণ দাসীর মত তিনি পথ চল্‌তেন। মন তেমনই উদাস। কোনো কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

অথচ সব দোষ আমার। একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লার টুক্‌রোর মত

চোখ নিয়ে পরদিন প্রভাতে ঘুম ভেঙে উঠে নিজেকে তিরস্কার করি—

"ছিঃ ছিঃ তোমার লজ্জা করে না। কি করে এমন কুৎসিৎ কাণ্ড করলে। আজ রবিবার, কালই কিন্তু যার জিনিষ তার হাতে তুলে দেওয়া চাই।"

অবশেষে সেই কাল এল। অন্যদিনের চাইতে কিছু আগেই মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়ালাম। অদূরে হাসিদি বেচারীকে দেখা গেল, ম্লান মুখ, যেন মলাটহীন গ্রন্থের মত বে-মানান। চোখ দুটি টল টল করছে।

আমি কাছে এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে ফুলটা বার করে বললাম—মাফ করবেন। এই ফুলটা বোধ হয় আপনার।

থমকে দাঁড়ালো হাসিদি। আমার হাতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। মাথাটা নীচু করে একটু ভালো করে দেখলো। যেন ঠিক চিন্‌তে পারছেন না কি বস্তু আমার হাতে। তারপর তাঁর শীর্ণ হাতটি এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে ফুলটা তুলে নিয়ে হাত দিয়ে চেপে ধরে রইলেন কিছুক্ষণ। তাবপর দুম্‌ড়ে মুচড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে হাইহিল জুতা দিয়ে পথের ধূলোয় পিষে ফেল্‌লেন। মুখে বিজাতীয় ঘৃণার ছাপ—এরপর গট মট করে চলে গেলেন। কোনো দিকে তাকালেন না। আমি অবাক হয়ে অনেকক্ষণ চুপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

এরপর আর কোনোদিন তাঁকে দেখিনি। আজো হাসিদির বিরক্তির কারণটা বুঝিনি।

ঝিণি স্থতোর মালা

পেট মোটা সরু গলাওলা বোতলটায় একরাশ ফুল বোঝাই করে কে সাজিয়ে রেখেছে। বোতলের গা থেকে রঙীন কাগজের লেবেলটি সযত্নে অপসারিত, তবু কিছু অংশ এখনও বোতলের গায়ে লেগে আছে, অনেক চেষ্টাতেও সেটুকু মোছা যায় নি।

বোতলটা যেখানে আছে, তার চারপাশে ধুলো—ঘরের চারদিকে ধুলো। দিনরাত যে রকম ঝড়ো হাওয়া বয় তাতে ঘরের জানলা দরজা বন্ধ রাখলেও ঘর ধুলোয় ভরে যায়। সারাদিন এমনই জলন্ত সূর্যের তেজ যে জানলার সার্সিতে মোটা করে নীল রঙ মাখানো হয়েছে তবু যেন চোখ ঝল্‌সে যায়।

ঘরটি কিন্তু সৌরভে ভরপুর। নাম-না-জানা কতো ফুল, রৌদ্র-তপ্ত-দিনটিকে স্নিগ্ধ করে তুলেছে। শাদা রঙের ফুল। চওড়া ঘন নীল পাতার মধ্যে শুভ্রস্তবক। কিছু কুঁড়িও আছে, সেগুলি হয়ত পরে ফুট্‌বে। নিষ্ঠুর নিদাঘের ওরা যেন শত্রু.—বিছানায়, ছবির গায়ে সর্বত্র ফুলের সমারোহ, কয়েকটি শাদা চাঁপা ফুলও যেন ঘরটিতে শীতল প্রলেপ এনে দিয়েছে।

রাজপথে দেখেছি আধুনিক বিলাসিনীরা স্বর্ণাভরণ ত্যাগ করে শুচিশুভ্র ফুলে দেহটিকে সাজিয়েছেন,—বোধ করি জ্বালা জুড়ানোর এমন ব্রহ্মাস্ত্র আর নাই।

এই বছর গ্রীষ্মের স্থরুতেই লড়াই ফতে হয়ে গেল। ঝড়ো হাওয়া, ধূলো বালি ঘর-দোর মন সব ভরে দিয়েছে। এই মরু বিজয় করে স্নিগ্ধ শ্যামলতায় পৌছাতে অনেক সময় লাগবে।

আমার চিন্তায় বাধা পড়ল। সামনে এসে দাঁড়ালো কৃশাঙ্গী এই মেয়েটা। পাতলা পুষ্টিহীন দেহে একটা লাবন্য আছে, চোখ

ছুটি যেন জলে ভরা। ঐ শীর্ণ দেহে অতো বড় চোখ কিঞ্চিৎ বে-মানান। চোখে মুখে তার খুসির হাসি, হাতে একগাছি মালা,—বোধকরি বেল ফুলের। বোতলে সজ্জিত ফুলগুলির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে—"ভাবী সুন্দর নয়? আপনার ভালো লাগে?"

—"তুমি বেখেছ বুঝি?"

—"হ্যাঁ, এই মালাটাও আপনার।"

এই বলে একগাল হেসে মালাটা আমার গলায় পরিয়ে দিল। এমনই তার সরল মধুব ভঙ্গী যে আমি বাধা দিলাম না।

মেয়েটি আবার বলে—"আমি জানতাম, আপনি আজ আস্‌বেন, তাই ঘরটা পরিষ্কার করে রেখেছি।"

"তা ত কবেছ, কিন্তু তুমি কে? তোমাকে ত দেখিনি।"

"আমি ঝি। মাষ্টারবাবু ঠিক করে দিয়েছেন। পাঁচ টাকা মাইনে, ঘর দোর ঠিক রাখতে হবে।" দায়িত্ব সম্পর্কে বেশ সচেতন ভঙ্গী!

বুঝ্‌লাম ষ্টেশন মাষ্টার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, বিদেশে বাঙালীর এই সহৃদয়তা বিস্ময়কর নয়। কিন্তু টিটলাগড়ের এই ধুলি রুক্ষ শহরে এই ছোট মেয়েটা এল কি করে।

"তোমাব নাম কি?"

"ছবি।"

"এ দেশে কতদিন আছো?"

"অনেক দিন, সেই কাটাকটির পর থেকে। আজ ত' সবাই ঘুমুচ্ছে, আপনার কি চা-টা কিছু চাই। আপনার চানের জন্য জল তুলে রেখেছি। রাস্তাব টিউকল থেকে।"

বুঝলাম মেয়েটি বয়সে ছোট হলেও বুদ্ধিহীনা নয়। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়।

বল্‌লাম—"অত বড ভারী বালতি তুমি তুলতে পারো?"

লজ্জিত ভঙ্গীতে ছবি বলে ওঠে—"না না, ভারী নয়, আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। প্রথমটা একটু কষ্ট হত।"

মুখ দেখে মেয়েটির বয়স স্থির করা কঠিন। মধুরভঙ্গী এবং লাবণ্য তার আসল বয়স ঢেকে দিয়েছে। তার চোখে বাল্যস্মৃতির এতটুকু রেশ নেই। তার দৈহিক আকৃতি দশ-এগার বছরের শিশুর মতো, পুষ্টিহীনতার ফলেই যে এই শারীরিক শীর্ণতা তা বোঝা যায়। বড় জোর বারো কিংবা তেরো তার বয়স, কিন্তু এর মধ্যে তার জীবনে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। বাল্য এবং কৈশোরের পরবর্তীকালে কতগুলি বছর এসে গেছে কে জানে।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে অনেক প্রশ্ন মুখের গোড়ায় এসেছিল, তাকে কথা বলানোর প্রচণ্ড বাসনা মনে জেগেছে। কিন্তু সংযত হলাম। তার চোখের ভীরু দৃষ্টি আমাকে স্তব্ধ করে দিল।

প্রতিদিন প্রাতে ছবি অজস্র ফুল নিয়ে আসে। এই সব ফুল অযত্ন বর্দ্ধিত, কেউ হয়ত কোনোদিন সেদিকে তাকায় না। কিন্তু ছবির চোখে ফুলের সৌন্দর্য অসীম। সন্ধ্যায় ছবি একগাছি মালা আনে। আমার ঘরে রাখা ঠাকুরের ছবিতে পরিয়ে দেয়। নির্জন প্রবাসে তার এই নীরব উপস্থিতি আমার মনটাও আনন্দের সৌরভে পরিপূর্ণ করে রেখেছে।

একদিন ছবি প্রশ্ন করে "মালাটি কি সুন্দর হয়েছে। ভারী চমৎকার দেখতে না? আমাদের দেশের বাড়ীতে পুকুরের ধারে এমনই ফুল গাছ ছিল, পিসিমা পূজো করতো তাই কোথা থেকে এনে বসিয়েছিলেন। আমি পিসিমাকে মালা গেঁথে দিতাম রোজ।"

ছবি গরীব ঘরের মেয়ে, দেশে চাষ বাস করে চলতো। চাষীর মেয়ে তাই তার হাতে পেলবতা নেই, কঠোর পরিশ্রমে সে হাত কর্কশ ও ক্লান্ত। এতদিনে ছবির জীবন কাহিনী আমি কতকটা আন্দাজ করে নিয়েছি। তবে একথাও জানি যে সে তার খেয়াল-খুসীমত সেই কাহিনী ধীরে ধীরে শোনাবে। কৌতূহলপ্রদ ক্রমশঃ

প্রকাশ্য উপন্যাসের মত আমাকে শুনতে হবে তাও তার ইচ্ছামত। আমার ইচ্ছায় নয়।

একদিন হঠাৎ প্রশ্ন করলাম—"ছবি, তোমার ভাই বোন কিছু ছিল না?"

"দিদির বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ী চলে গেল, সে অনেক দূরের পথ গরুর গাড়িতে একদিন লাগে। আমার দাদা ছিল এক বছরের বড়, —গুরু মশায়ের পাঠশালায় নামতা পড়েছিল কিছুদিন। তার কাছে আমিও নামতা শিখেছি। খুব চালাক ছেলে। আচ্ছা, আপনি আমাকে পড়াতে পারেন না, যখন কাজ থাকবে না আমি বই নিয়ে আসবো?"

আমি অন্যমনস্ক ভাবে বললাম—"আচ্ছা, পড়াবো।"

লক্ষ্য করতাম, তার পোষাক পরিচ্ছদ বেশ পরিচ্ছন্ন, তবে সেগুলি ওর আয়তনের চেয়ে অনেক বড়ো এবং পুরানো। নিশ্চয়ই কেউ দিয়ে থাকবে। কখনো ফ্রক কখনও শাড়ি। শাড়িটা আবার হলুদ রঙে ছোপানো। আমি প্রশ্ন করতে বলেছিল সহজে ময়লা ধরে না তাই রঙ করে নিয়েছে। সে একটু চড়া রঙ পছন্দ করে। মাথার চুল কয়েকদিন শুকনো থাকার পর সহসা এক সময় তৈলাক্ত হয়ে উঠত। বেশ সিঁথি করে চুলটা সাজাতো। মনে হত কেউ যত্ন করে বেঁধে দিয়েছে। বেশীর ভাগই বেনীটা পিঠে ঝুলতো। ছবি কিন্তু মোটেই সুশ্রী নয়, কেউ তার দিকে হয়ত তাকিয়েও দেখতো না কোনদিন, কিন্তু সে প্রেতপুরীর প্রতীক। তার পিছনে রয়েছে একটা নিদারুণ উৎপীড়নের করুণ ইতিহাস।

কখনো দুই কাণের বিঁধে ফুল গুজে একগাল হেসে দাঁড়াতো, বলতো "কেমন গয়না দেখেছেন?" কথায় বেশ গর্বিত ভঙ্গী ছিল, কিন্তু বেদনা ছিল না।

একবার ছবি বলছিল—"মা, বলেছিল নবান্নর সময় আমাকে

মুখ দেখে মেয়েটির বয়স স্থির করা কঠিন। মধুরভঙ্গী এবং লাবণ্য তার আসল বয়স ঢেকে দিয়েছে। তার চোখে বাল্যস্মৃতির এতটুকু রেশ নেই। তার দৈহিক আকৃতি দশ-এগার বছরের শিশুর মতো, পুষ্টিহীনতার ফলেই যে এই শারীরিক শীর্ণতা তা বোঝা যায়। বড় জোর বারো কিংবা তেরো তার বয়স, কিন্তু এর মধ্যে তার জীবনে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। বাল্য এবং কৈশোরের পরবর্তীকালে কতগুলি বছর এসে গেছে কে জানে।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে অনেক প্রশ্ন মুখের গোড়ায় এসেছিল, তাকে কথা বলানোর প্রচণ্ড বাসনা মনে জেগেছে। কিন্তু সংযত হলাম। তার চোখের ভীরু দৃষ্টি আমাকে স্তব্ধ করে দিল।

প্রতিদিন প্রাতে ছবি অজস্র ফুল নিয়ে আসে। এই সব ফুল অযত্ন বর্দ্ধিত, কেউ হয়ত কোনোদিন সেদিকে তাকায় না। কিন্তু ছবির চোখে ফুলের সৌন্দর্য অসীম। সন্ধ্যায় ছবি একগাছি মালা আনে। আমার ঘরে রাখা ঠাকুরের ছবিতে পরিয়ে দেয়। নির্জন প্রবাসে তার এই নীরব উপস্থিতি আমার মনটাও আনন্দের সৌরভে পরিপূর্ণ করে রেখেছে।

একদিন ছবি প্রশ্ন করে "মালাটি কি সুন্দর হয়েছে। ভারী চমৎকার দেখতে না? আমাদের দেশের বাড়ীতে পুকুরের ধারে এমনই ফুল গাছ ছিল, পিসিমা পূজো করতো তাই কোথা থেকে এনে বসিয়েছিলেন। আমি পিসিমাকে মালা গেঁথে দিতাম রোজ।"

ছবি গরীব ঘরের মেয়ে, দেশে চাষ বাস করে চলতো। চাষীর মেয়ে তাই তার হাতে পেলবতা নেই, কঠোর পরিশ্রমে সে হাত কর্কশ ও ক্লান্ত। এতদিনে ছবির জীবন কাহিনী আমি কতকটা আন্দাজ করে নিয়েছি। তবে একথাও জানি যে সে তার খেয়াল-খুসীমত সেই কাহিনী ধীরে ধীরে শোনাবে। কৌতূহলপ্রদ ক্রমশঃ

প্রকাশ্য উপন্যাসের মত আমাকে শুনতে হবে তাও তার ইচ্ছামত। আমার ইচ্ছায় নয়।

একদিন হঠাৎ প্রশ্ন করলাম—"ছবি, তোমার ভাই বোন কিছু ছিল না?"

"দিদির বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ী চলে গেল, সে অনেক দূরের পথ গরুর গাড়িতে একদিন লাগে। আমার দাদা ছিল এক বছরের বড়, —গুরু মশায়ের পাঠশালায় নামতা পড়েছিল কিছুদিন। তার কাছে আমিও নামতা শিখেছি। খুব চালাক ছেলে। আচ্ছা, আপনি আমাকে পড়াতে পারেন না, যখন কাজ থাকবে না আমি বই নিয়ে আসবো?"

আমি অন্যমনস্ক ভাবে বললাম—"আচ্ছা, পড়াবো।"

লক্ষ্য করতাম, তার পোষাক পরিচ্ছদ বেশ পরিচ্ছন্ন, তবে সেগুলি ওর আয়তনের চেয়ে অনেক বড়ো এবং পুরানো। নিশ্চয়ই কেউ দিয়ে থাকবে। কখনো ফ্রক কখনও শাড়ি। শাড়িটা আবার হলুদ রঙে ছোপানো। আমি প্রশ্ন করতে বলেছিল সহজে ময়লা ধরে না তাই রঙ করে নিয়েছে। সে একটু চড়া রঙ পছন্দ করে। মাথার চুল কয়েকদিন শুকনো থাকার পর সহসা এক সময় তৈলাক্ত হয়ে উঠত। বেশ সিঁথি করে চুলটা সাজাতো। মনে হত কেউ যত্ন করে বেঁধে দিয়েছে। বেশীর ভাগই বেনীটা পিঠে ঝুলতো। ছবি কিন্তু মোটেই সুশ্রী নয়, কেউ তার দিকে হয়ত তাকিয়েও দেখতো না কোনদিন, কিন্তু সে প্রেতপুরীর প্রতীক। তার পিছনে রয়েছে একটা নিদারুণ উৎপীড়নের করুণ ইতিহাস।

কখনো দুই কাণের বিঁধে ফুল গুজে একগাল হেসে দাঁড়াতো, বলতো "কেমন গয়না দেখেছেন?" কথায় বেশ গর্বিত ভঙ্গী ছিল, কিন্তু বেদনা ছিল না।

একবার ছবি বলছিল—"মা, বলেছিল নবান্নর সময় আমাকে

সোনার বালা গড়িয়ে দেবে। কিন্তু সেবার ভালো ফসল হল না, বালা আর হল না।"

আমি ছবির জন্য কাঁচের চুড়ি কিনে আনলাম। মনে হল ছবি খুসী হল, তার মুখে হাসি আর ধরে না।

একটু পরে চা নিয়ে এল, আমি বিস্কুট বার করে তাকে একখানা দিলাম। ছবি হেসে আঁচলে বাধলো, বলল—"আপনি বিস্কুট খেতে বুঝি ভালবাসেন? আমার মা কিন্তু ভারী চমৎকার পিঠে বানাতো নারকোল আর গুড় দিয়ে যে কি চমৎকার হ'ত। আচ্ছা এখানে গুড় পাওয়া যায়?"

আমি একদিন প্রশ্ন করলাম—"তোমার বাবার কথা কিছু মনে নেই?"

"বাবা, অনেকদিন মারা গেছে। আমার খুড়ো আর খুড়িমা ছিল জমি জমার কাজ খুড়োই দেখত। ফসল বিক্রী করত।

একদিন আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল ছবি, একেবারে শিশুর মন নিস্পাপ তার সারল্য।

বলল—"একটা গল্প বলবেন? পিসিমা কেমন গল্প বলতেন। তার সেই সরলতায় সেদিন অবাক হইনি। বুঝলাম আমার প্রশ্রয় পেয়ে তার মনের স্বাভাবিক গতি প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে।

ছবি বলল—"আপনাকে আমার ভালো লাগে। আচ্ছা আপনার কাছে আমাকে রাখতে পারেন না! তা হলে আমি আর কোথাও যাই না। ওরা আমাকে দেখতে পারে না।"

আমি সেদিন সহসা প্রশ্ন করলাম—"ছবি, তুমি এদেশে কি করে এলে?"

এতদিন নানা বিভীষিকা মনে মনে কল্পনা করেছি, আজ তার মুখেই সেই আতংককর কাহিনী শুনতে চাই।

"পুলিশ নিয়ে এসেছে। অনেক লোকের সঙ্গে আমরাও

আসছিলাম, পথে আমার ভাইকে ওরা কোথায় টেনে নিয়ে গেল। যারা যেদিকে যেতে পারে সেইদিকে ছুটলো। আমি কোথায় যে ছিলাম জানি না। জ্ঞান হতে দেখলাম রেলষ্টেশন। সেখানে অনেক ছেলে মেয়ে, অনেক বুড়ো বুড়ির ভীড়। একজন হিন্দুস্থানী আমাকে খাবাব দেবে বলে ধরে নিয়ে এসেছিল। তারপর পুলিস এনে এইখানে ছেড়ে দিয়েছে। মাষ্টাববাবু বললেন আমাব দেশেব মেয়ে, তাই ওর কাছে রেখে চলে গেল।”

আমি বললাম—“তুমি হিন্দুস্থানীর সঙ্গে গেলে কেন?”

“কি করবো। আমার যে বড়ো খিদে পেয়েছিল। দুদিন খেতে পাইনি। তাই যখন বলল খাবার দেবে আমি ভাবলাম হয়ত দয়া হয়েছে। তাই চলে এলাম।”

“তাবপর—”

“তারপর আমি দেখলাম লোকটা আমাকে নানা রকম বোঝাচ্ছে আর কিছুতেই আমাকে সবায়ের কাছে ফিরে যেতে দিল না। তখন বুঝলাম, একটা কিছু হয়েছে। আমি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলাম। সবাই মিলে শেষে পুলিসকে ধরিয়ে দিল।”

আমি আবার প্রশ্ন করি—“তোমার মার কি হল?”

—“মা বা ভাই কারো খবর জানি না। তারা হয়ত আর বেঁচে নেই। ভালোই হয়েছে, থাকলে কি করতো। কি খেত? কোথায় থাকতো?

সত্যই ত, কি করত, কি খেত, কোথায় থাকতো? আমি ভাবতে থাকি।

ছবির কণ্ঠস্বর কেমন অবসন্ন। যেন ঘুমের ঘোরে কথা বলছে, আর আমি চুপ করে শুনছি ছোট্ট মেয়ের মুখে রূপ কথা। এ যুগের মর্মান্তিক রূপকথা!

প্রশ্ন করি—“ছবি তোমার পিসিমার কি হল

—“পিসিমা হাঙ্গামা সুরু হতেই যেন কি রকম হয়ে গেল।

দিন রাত গোপাল, গোপাল করে কাঁদতো। গোপাল ঠাকুর কিন্তু কিছু করতে পারলেন না।”

“গোপাল ঠাকুর কি তোমার পিসিমা পূজো করতেন ?”

“হ্যাঁ! গোপালকে জড়িয়ে ভিটে আগলে পিসিমা বসেছিলেন, ওরা পিসিমার হাতটা কেটে গোপালকে ভেঙে চুরমার করলো। পিসিমাও সঙ্গে সঙ্গে পুকুরে গিয়ে ডুবলো, আর উঠলো না।’

বুঝলাম পিসিমা পুরাণের নায়িকা। মহিষমর্দিণীর অনুকরণ করতে গিয়ে পরাজিত।

মনে মনে ভাবছি একটা শান্ত গ্রামের কথা। এমনই এক গ্রাম জানতাম, সে গ্রামও হয়ত আজ শ্মশান। সেদিনের ছেলে মেয়েরা ছবির মতো ছিন্নমূল হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। জল তুলে বাসন মেজে খায়, আর সময় পেলে গল্প বলে—

ছবি সহসা বলে ওঠে—“দেখুন, মালাটা কত বড়ো হয়েছে, কি সুন্দর দেখাচ্ছে !

ছবির হাতে তৈরী সেই বিনি সূতোর মালা আমার চোখে বিষধর সর্পের মত ভয়ংকর মনে হল। এই কালসর্প লোহার ঘরে শায়িত লখীন্দরের কি ক্ষমা করবে ?